লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক
আহ্‌মদী

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

নব পর্যায় ৭৮ বর্ষ | ১৬তম সংখ্যা

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৭ ফাল্গুন, ১৪২২ বঙ্গাব্দ | ২০ জামা: আউ:, ১৪৩৭ হিজরি | ২৯ তবলিগ, ১৩৯৫ হি. শা. | ২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ ঈসাব্দ

বাংলাদেশের ৯২তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

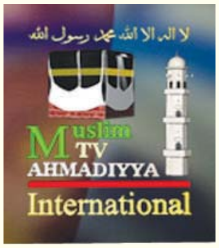

এমটিএ-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

এমটিএ-তে খুতবা প্রচারের সময় সূচি

(১) শুক্রবার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০ সরাসরি সম্প্রচার। পুনঃপ্রচার রাত ১০.২০ মিনিট এবং রাত ৩.০০।

(২) শনিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সকাল ৮.১০ এবং বিকাল ৫.০০।

(৩) রবিবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় সন্ধ্যা ৭.০০।

(৪) বৃহস্পতিবার একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় রাত ৮.০০।

mta INTERNATIONAL

এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা **হযরত মির্যা গোলাম আহ্মদ প্রতিশ্রুত মসীহ ও ইমাম মাহ্দী (আ.)** রচিত **'আল্ ইস্তিফতা'** পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহাদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

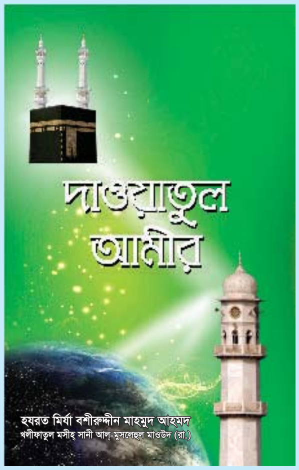

হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী আল্-মুসলেহুল মাওউদ (রা.) রচিত **'দাওয়াতুল আমীর'**-এর বাংলা অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ।

ভাষান্তর করেছেন **মাওলানা ফিরোজ আলম**।

৩১৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত বইটির **মূল্য ১৫০/- (একশত পঞ্চাশ টাকা)**।

বইটি আহমদীয়া লাইব্রেরীতে পাওয়া যাচ্ছে।

আপনার কপিটি আজই সংগ্রহ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
০১৭১৬-২৫৩২১৬

"Love For All, Hatred For None."

Hakim Watertechnology

"Best Water, Best Life"

House hold/Official | Commercial/Industrial | Pet Bottling

46/A Kakrail (VIP Roa), 2nd Floor, Dhaka-1000, Tel: 02-9337056, Cell: 01611-338989, 01711-338989
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

সম্পাদকীয়

পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করবেন আর জাতিসমূহ তাঁর কাছ থেকে আশিস লাভ করবে

পৃথিবীতে এমন মহা পুরুষগণ এসেছেন, যাদের আগমণ বার্তা আল্লাহ্ তা'লা তাঁদের জন্মের পূর্বেই জগদ্বাসীকে জানিয়েছেন। এমন-ই এক মহান সত্তা ছিলেন মুসলেহ্ মাওউদ হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)। হিজরী চতুর্দশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৮৮৬ সালের ২২ জানুয়ারি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নির্দেশিত হয়ে হুশিয়ারপুরে যান। ইসলামের চরম দুর্দিন দেখে অত্যন্ত ব্যাথাতুর হৃদয়ে ইসলাম এবং মহানবী (সা.)-এর সত্যতার সমর্থনে বিশেষ নিদর্শন কামনা করে তিনি সেখানে চল্লিশ দিন পর্যন্ত নির্জনে নিভৃতে আল্লাহ্ তা'লার কাছে সকাতর দোয়া করেন। এরপর ২০ ফেব্রুয়ারি একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এতে বহু ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে এক প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্মলাভের সুসংবাদও ছিল।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, "…….তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, তিনি আল্লাহর নূর ….. সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধি-মুক্ত করবে….. জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে…… সে শীঘ্র শীঘ্র বাড়বে এবং বন্দীদের মুক্তির কারণ হবে। আর পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিসমূহ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে" (ইশতেহার, ২০ ফেব্রুয়ারি, ১৮৮৬)। খোদা তা'লার ওয়াদা অনুযায়ী এ প্রতিশ্রুত পুত্রের জন্ম হলে তার নাম রাখা হলো মির্যা বশীর উদ্দিন মাহমুদ আহমদ।

মাত্র ২৫ বছর বয়সে ১৯১৪ সালে তিনি আহমদীয়া জামা'তের দ্বিতীয় খলীফা নির্বাচিত হোন। দীর্ঘ ৫২ বছর খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত থেকে এক দূর্বল, অসহায়, অর্থ-সম্পদহীন জামা'তকে মজবুত এক ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়ে গেছেন তিনি। জামা'তকে উপমহাদেশের গন্ডি থেকে বের করে বহির্বিশ্বের কোণায় কোণায় সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর জীবদ্দশাতেই প্রায় অর্ধশত দেশে জামা'ত প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তাঁর আশিসপূর্ণ কল্যাণধারা 'তাহরীকে জাদীদ'-এর সুফল লাভে বর্তমানে দুই শতাধিক দেশে এই জামা'ত সাংগঠনিক কাঠামো লাভ করেছে। আর সেই অগ্রযাত্রা সদা প্রবহমান রয়েছে।

তাঁর জ্ঞান ছিল অসাধারণ। তিনি হাজারো বক্তৃতা, দু'শতাধিক পুস্তক, কুরআনের অতুলনীয় তফসীর-এর মাধ্যমে রেখে গেছেন জ্ঞানের এক বিশাল সমুদ্র। তাঁর রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতাও ছিল অতুলনীয়। জগৎ দেখেছে আর ভবিষ্যতেও দেখবে কিভাবে তিনি মুসলেহ্ মাওউদ হয়েছেন, আর কিভাবে সেই সব প্রতিশ্রুতি তাঁর মাধ্যমে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। তিনি একাধারে যেমন কাশ্মীরের নিপীড়িত মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর' কমিটি গঠন করেছেন তেমনি ফিলিস্তিন ও মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছেন ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে।

হযরত মির্যা মাহমুদ স্বয়ং-ই যে 'মুসলেহ্ মাওউদ' বা সেই প্রতিশ্রুত পুত্র তা তিনি নিজেই ১৯৪০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে জ্ঞাত হয়ে ঘোষণা দেন। এ জন্য আল্লাহ্ তা'লার শুকরিয়া আদায়ের লক্ষ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতি বছর এই দিনটিতে তাঁর কর্মময় জীবন নিয়ে আলোচনা করে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস উদযাপন করে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে এই মহান ব্যক্তির জীবনাদর্শ অনুসরণ করে চলার তৌফিক দান করুন।

'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উপলক্ষে ভাষা শহীদদের প্রতি জানাই বিনম্র শ্রদ্ধা

ফেব্রুয়ারি মাস আমাদের জাতীয় জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাস। ১৯৫২সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' শ্লোগান বুলেটের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে ঢাকার আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে তুলেছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বারসহ আরো কত নাম না জানা বাংলার বীর সন্তানেরা। টগবগে রক্ত ঝরানো বাংলা মায়ের দামাল ছেলেদের সেই আত্মত্যাগের বিনিময়ে আমরা প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছি আমাদের প্রিয় ভাষা– মাতৃভাষা বাংলাকে 'রাষ্ট্রভাষা' হিসেবে।

পাকিস্তানের অন্ধ, স্বৈর-শাসকগোষ্ঠীর বাংলা বিদ্বেষ থেকে বাঙ্গালীরা প্রতিবাদী, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। মাতৃভাষার জন্য মর্যাদা ও মহিমা সমুন্নত ও অম্লান করে রাখতে এই আত্মদান সারা পৃথিবীতে প্রথম। আজ সমগ্র বিশ্বে তাদের এ ত্যাগ স্বীকৃত হয়ে একুশে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' এর মর্যাদা পেয়েছে। তাদের এ আত্মত্যাগ জাতি হিসেবে আমাদের করেছে গরীয়ান। ধন্য এই বীর-সন্তানেরা।

আমরা এই দিনে সেইসব বীর-সন্তানদের পরম ভালবাসায় স্মরণ করার পাশাপাশি নিজেরা যদি অঙ্গীকারাবদ্ধ হই মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য নিজেদেরকে অগ্রগামী করে গড়ে তোলার প্রয়াসে সদা তৎপর থাকার, তবেই এই একুশে উদযাপন স্বার্থক হবে।

সূচিপত্র

২৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬

কুরআন শরীফ ৩

হাদীস শরীফ ৪

অমৃত বাণী ৫

'বারাহীনে আহমদীয়া'
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ৬

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ৯

ইযালা-এ-আওহাম (সন্দেহ-সংশয় নিরসন)
প্রনয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১
হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ ১৭

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত
হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর
২৯ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের **জুমুআর খুতবা** ১৯

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও কুরআন চর্চা ২৬
মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর
মহান কার্যাবলীর এক ঝলক ৩০
মাহমুদ আহমদ সুমন

আল্লাহ্ তা'লার দরবারে
বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি কামনা করে
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের
৯২তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত ৩৪

সংবাদ ৪২

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ ৪৬

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর
বিশেষ দোয়ার তাহরীক ৪৮

'পাক্ষিক আহমদী' নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন।
পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন **'পাক্ষিক আহমদী'**র সাথেই থাকুন।
ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে **'পাক্ষিক আহমদী'** পড়তে **Log in** করুন
www.ahmadiyyabangla.org

কুরআন শরীফ

সূরা আন্ নাহ্‌ল-১৬

৩৪। এ (কাফিররা) কি কেবল তাদের কাছে ফিরিশ্‌তাদের আগমনের অথবা তোমার প্রভু-প্রতিপালকের সিদ্ধান্ত আসার অপেক্ষায়[১৫৪৩] পথ চেয়ে আছে? এদের পূর্ববর্তীরাও তা-ই করেছিল। আর আল্লাহ্ তাদের ওপর কোন অন্যায় করেন নি, বরং তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অন্যায় করতো।

هَلْ يَنْظُرُوْنَ اِلَّآ اَنْ تَاْتِيَهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ
اَوْ يَاْتِيَ اَمْرُ رَبِّكَ ؕ كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ
مِنْ قَبْلِهِمْ ؕ وَ مَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ
وَلٰكِنْ كَانُوْٓا اَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُوْنَ ﴿۳۴﴾

৩৫। অতএব তাদের কৃতকর্মের মন্দ (ফল) তাদের ধরে ফেললো এবং তারা যা নিয়ে ঠাট্টাবিদ্রূপ করতো তা তাদের ঘিরে ফেললো[১৫৪৪]।

فَاَصَابَهُمْ سَيِّاٰتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ
مَّا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ ﴿۳۵﴾ ع

৩৬। আর যারা শির্ক করে তারা বলে, 'আল্লাহ্ যদি চাইতেন তাহলে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কিছুর ইবাদত করতাম না বা আমাদের পিতৃপুরুষও (করতো না) এবং তাঁর (আদেশ) ছাড়া আমরা কোন কিছু নিষিদ্ধও করতাম না। তাদের পূর্ববর্তীরাও তা-ই করেছিল। কিন্তু স্পষ্টভাবে বাণী পৌঁছে দেয়া ছাড়া রসূলদের আর কোন দায়িত্ব আছে কি?

وَقَالَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا لَوْ شَآءَ اللّٰهُ مَا
عَبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ نَّحْنُ وَلَآ
اٰبَآؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ؕ
كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ
فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِيْنُ ﴿۳۶﴾

৩৭। আর প্রত্যেক উম্মতে আমরা (কোন না কোন) রসূল অবশ্যই (এ আদেশ দিয়ে) পাঠিয়েছি, 'তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদত কর এবং প্রতিমা (পূজা) পরিহার কর।' অতএব তাদের কোন কোন লোককে আল্লাহ্ হেদায়াত দিলেন এবং তাদের কারো কারো জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হলো। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করে দেখ প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণাম কি হয়েছিল।

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنِ اعْبُدُوا
اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَّنْ
هَدَى اللّٰهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ
الضَّلٰلَةُ ؕ فَسِيْرُوْا فِي الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا
كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِيْنَ ﴿۳۷﴾

১৫৪৩। এখানে ফিরিশ্‌তার আগমন দ্বারা কাফিরদের এক এক ব্যক্তির ধ্বংস বুঝায় এবং আল্লাহ্ তা'লার আগমন বা হুকুম দ্বারা গোটা জাতির ধ্বংস বুঝায়।

১৫৪৪। কুকর্ম বা পাপাচারের শাস্তি কোন বাইরের অপ্রাসঙ্গিক বিষয় নয়, বরং সংশ্লিষ্ট কর্মের স্বাভাবিক ফলাফল এবং এর সমানুপাতিকও বটে।

হাদীস শরীফ

মহান আল্লাহ্ তা'লাই সবার সর্বোত্তম অভিভাবক

আমরা যেন আমাদের জীবনে কখনও খোদার ওপর আস্থা না হারাই, আমাদের সবকিছুই তিনি।

কুরআন ঃ

আর তিনি তাকে এমন দিক থেকে রিয্‌ক দিবেন যা সে কল্পনাও করতে পারে না। এবং যে আল্লাহ্‌র ওপরে নির্ভর করে তিনি তার জন্যে যথেষ্ট। নিশ্চয় আল্লাহ্ নিজ উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করে থাকনে। আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের পরিমাণ অবশ্যই নির্ধারণ করে রেখেছেন। (সূরা তালাক, আয়াত : ৪)

হাদীস ঃ

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, হযরত ইব্রাহীম (আ.)-কে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হলো, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট। এবং তিনি উত্তম অভিভাবক।' আর লোকেরা যখন হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও তাঁর সঙ্গীদেরকে মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত (খন্দকের যুদ্ধ) হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর। তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল। তারা বলেছিল, 'হাসবুনাল্লাহু ওয়া নি'মাল ওয়াকীল' অর্থাৎ আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি উত্তম অভিভাবক (বুখারী)।

ব্যাখ্যা ঃ

পৃথিবীতে মানুষ সর্বদাই মহাশক্তির আশ্রয়ের সন্ধানে রয়েছে। মানবীয় দুর্বলতার কারণে আত্মরক্ষা, নিরাপত্তা ও জীবিকার কারণে নিজ হতে শক্তিশালী সত্তার সন্ধান করে আসছে। তাই আমরা ইতিহাস থেকে জানতে পারি যে, কখনও সূর্য, চন্দ্র, তারকা বা কখনও গাছপালা বা কখনও মাটির বিভিন্ন আকৃতি বা মানুষকে মহাশক্তিধর এদের পূজা আর্চনা করেছে, যাতে মানুষ বিভিন্ন সমস্যার সমাধান পায়। অপরদিকে সবকিছুর মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলা এক লাখ চব্বিশ হাজার বা দুই লাখ চব্বিশ হাজার নবী পাঠিয়ে মানবজাতিকে সংবাদ দিয়ে আসছেন তোমাদের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন যিনি সকল ক্ষমতার অধিকারী; তোমরা তাঁর উপাসনা কর। তিনি সকল বিষয়ে সর্বশক্তিমান।

খোদা তা'লা তাঁর মহাপরাক্রমশালী সত্তাকে যুগে যুগে মানবজাতির সামনে তাঁর ঐ সকল ব্যক্তি দ্বারা দিনের ন্যায় উজ্জ্বলভাবে তুলে ধরেছেন যাঁরা তাঁর ওপর ঈমান আনে ও তাঁর ওপর ভরসা রাখে।

কুরআনের আয়াতটিতে আল্লাহ্ তা'লা জানাচ্ছেন, যে খোদা তা'লার ওপর ভরসা রাখে খোদা তার জন্য যথেষ্ট হন। তার সকল সমস্যার সমাধানকারী হন।

হাদীসে আল্লাহ্‌র ওপর ভরসাকারী দু'জন মহানবীর দু'টি এমন ঘটনা বর্ণনা করা হয়েছে যা হতে উত্তরণ লাভ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারও দ্বার সম্ভব নয়। প্রথমটি হযরত ইব্রাহীম (আ.)-এর আগুনে নিক্ষেপ করার ঘটনা। দ্বিতীয়টি খন্দকের যুদ্ধের ঘটনা। দুটি ঘটনাতে আল্লাহ্‌র প্রিয় বান্দার মুকাবেলায় শত্রুরা প্রবল ক্ষমতাধর ও নিজ ভাবনায় অপরাজেয় ছিল। কিন্তু খোদার বান্দারা ঐ সময় যখন মৃত্যু নিশ্চিত ভেবে বলে উঠলেন, 'হাসবুনাল্লাহু নি'মাল ওয়াকীল' আর খোদাও তা দেখিয়ে দিলেন যে, তিনি উত্তম অভিভাক ও তিনি তাঁর নেক বান্দাদের জন্য যথেষ্ট।

এই হাদীসে আমাদেরকে শিক্ষা দিচ্ছে, আমরা যেন আমাদের জীবনে কখনও খোদার ওপর আস্থা না হারাই। আমাদের সবকিছুই তিনি। আমরা যদি তাঁকে সব কিছু মনে করি তবে তিনি আমাদের সর্বোত্তম অভিভাক। আল্লাহ্ করুন আমরা যেন সবাই খোদার ওপর পূর্ণ ভরসাকারী হই, আমীন।

আলহাজ্জ মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ্

অমৃতবাণী

নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে

হযরত ইমাম মাহদী (আ.)

এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় আস্ফালন রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে।

মসীহ ও মাহদীর আবির্ভাবের লক্ষণাবলী যে প্রকাশ পেয়েছে তা তুমি জানো। নৈরাজ্য বাড়তে বাড়তে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। বিশৃঙ্খলা ছেয়ে গেছে বরং তা ফুঁসে ওঠে উত্তাল রূপ ধারন করেছে। অলিতে-গলিতে এবং বাজারে-বন্দরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-কে তারা গালি দেয়। উম্মত মৃতপ্রায়। চলার শক্তি হারিয়ে ফেলেছে এবং এর বিদায়ক্ষণ ঘনিয়ে এসেছে। সুতরাং তোমরা এ অপদস্থ ধর্মের প্রতি করুণা কর, কেননা বিদায় ঘন্টা বেজে উঠেছে। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র দোহাই দিচ্ছি। তোমরা কি এ বিশৃঙ্খল পরিস্থিতি দেখতে পাচ্ছো না? ঈমানের আধ্যাত্মিক পানীয়কে জাগতিক ধন- সম্পদের বিনিময়ে কি পরিত্যাগ করা হচ্ছে না?

আল্লাহ্ তা'লার খাতিরে সাক্ষ্য দাও, হ্যাঁ সাক্ষ্য দাও, একথা সত্য-নাকি মিথ্যা? আমরা খ্রিষ্টানদের ষড়যন্ত্রের চেয়ে বড় কোন চক্রান্ত দেখিনি। আমরা তাদের হাতে বন্দীর মত অসহায়। তারা দুষ্কৃতির আশ্রয় নিলে ইবলীসকেও হার মানায়।

দুঃখ-কষ্ট ও নৈরাশ্য সর্বত্র ছেয়ে গেছে আর মানুষের হৃদয় পাষাণ হয়ে গেছে। তারা কুমন্ত্রণাদাতার কুমন্ত্রণার অনুসরণ করছে আর 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'র সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে বরং তারা এ রীতির বিরোধীতা করে হীন-পতিত বস্তু সদৃশ হয়ে গেছে। আমি যা দেখেছি এবং গভীর অনুসন্ধানের পর যা প্রকাশিত হয়েছে এর খুব কমই বর্ণনা করেছি।

আল্লাহ্‌র কসম! সমস্যা চরম পর্যায়ে উপনীত। এ উম্মতের মাঝে শুধু বাহ্যিকতা আর বড় বড় আস্ফালন রয়ে গেছে। অন্ধকার একে ঘিরে ফেলেছে এবং আলো হারিয়ে গেছে। বন্যপশু আমাদের ক্ষেতকে পদতলে পিষ্ট করেছে। এর পানি বা চারণভুমি কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। নৈরাজ্যের উপচে পড়া বন্যায় মানুষ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে গেছে। সুতরাং আমার প্রভুর পক্ষ থেকে আমাকে একটা নৌকা দেয়া হয়েছে আর আল্লাহ্‌র নামেই এর যাত্রা এবং স্থিতি।

এ সম্পর্কে বিস্তারিত বলছি। আল্লাহ্ তা'লা এ যুগে খ্রিষ্টানদের ভ্রষ্টতাকে বিভিন্ন প্রকার ঔদ্ধত্যের আকারে প্রকাশ পেতে দেখেছেন। তিনি দেখেছেন, তারা নিজেরা পথভ্রষ্ট হয়েছে, একই সাথে সৃষ্টির একটি বিরাট অংশকেও পথভ্রষ্ট করেছে আর তারা অনেক বড় ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করেছে এবং চরম অরাজকতা ও ধর্মহীনতার প্রসার ঘটাচ্ছে। সমুজ্জ্বল ইসলামী শরীয়তের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ করেছে আর পাপ ও লাগামহীন কুপ্রবৃত্তির দুয়ার খুলে দিয়েছে।

এ ভয়াবহ নৈরাজ্যের সময় মহিমান্বিত খোদার আত্মাভিমান নিজ মহিমা প্রদর্শন করেছে। এর পাশাপাশি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলাও চরম রূপ ধারণ করেছিল। এরা মতভেদের মাধ্যমে সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূলের (সা.) ধর্মকে বহুধা বিভক্ত করেছে। এদের একে অন্যের বিরুদ্ধে দুষ্কৃতকারীর মত আক্রমণ করেছে।

আল্লাহ তা'লা আমাকে এদের মতভেদ দুর করার জন্য মনোনীত করেছেন এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণে আমি মুমিনদের জন্য আগত সেই 'ইমাম' আর আমিই খ্রিষ্টান ও তাদের লালনকারীদের জন্য অকাট্য যুক্তি প্রমাণ উপস্থাপনকারী সেই 'মসীহ্'।

(সিররুল খিলাফা পুস্তক, বাংলা সংস্করণ পৃষ্ঠা ৭৬ থেকে উদ্ধৃত)

‘বারাহীনে আহমদীয়া’

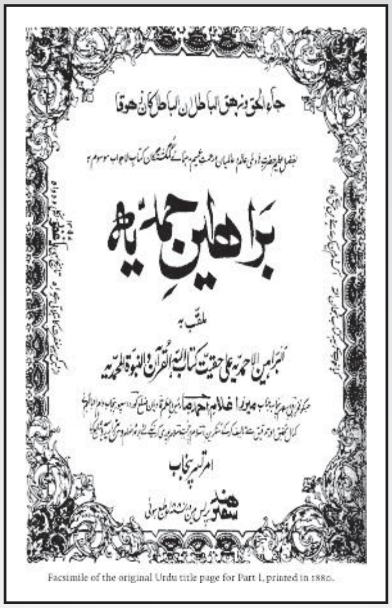
براہین احمدیہ

امرتسر پنجاب

Facsimile of the original Urdu title page for Part I, printed in 1880.

হযরত মির্যা গোলাম আহ্‌মদ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত-এর পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা

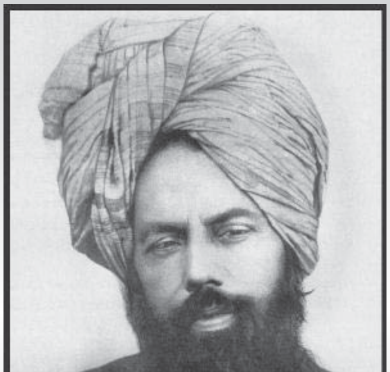

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী

(১১তম কিস্তি)

এমন ক্ষেত্রে সে গ্রন্থের পাঠকদের পক্ষে সঠিকভাবে কোন কথা বোঝা এবং সঠিকভাবে কোন মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পাওয়া অসম্ভব হয়ে যায় আর যাদের কাছে দ্বিতীয় পক্ষের বই এর কোন অনুলিপি থাকে না। অতএব এটি যেহেতু অত্যন্ত উন্নত মানের গ্রন্থ এবং সত্য মিথ্যার পার্থক্য নিরূপনের মানসে যাতে বিধৃত প্রমাণাদি পুরোপুরী খন্ডনকারীকে বড় অংকের পুরস্কার দেয়ার প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে; তাই এমন গ্রন্থের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতারণা ও প্রহসনের পথ বেছে নেয়া একটি অযথা ও অনর্থক ধূর্ততা বৈ কিছু নয়। সুতরাং পরম তাকিদ সহকারে লিখা হচ্ছে যে, কেবল মাত্র তখনই কোন উত্তরদাতা বা খন্ডনকারী বিজ্ঞাপনের শর্ত হতে লাভবান হতে পারবে যদি সে আমাদের মুখ-নিঃসৃত বক্তৃতা এবং যে ধরনের বিষয় আমাদের গ্রন্থে লিখা রয়েছে তা নিখুঁতভাবে এর এক এক অক্ষর একই ধারাবাহিকতায় উল্লেখ করে; আর সততা ও স্বচ্ছতা এতেই নিহিত।

তৃতীয়তঃ- প্রত্যেক ব্যক্তির সামনে এটিও স্পষ্ট থাকে যে, আমরা এ গ্রন্থে কুরআন ও হযরত খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর সত্যতার যত প্রমাণাদি লিপিবদ্ধ করেছি বা কুরআন শরীফের সৌন্দর্য ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে এবং এর আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নিদর্শন হওয়া সংক্রান্ত যে সকল প্রমাণাদি উল্লেখ করেছি বা এর পক্ষে যে ধরনের দাবি করেছি তার অনুকূলে প্রমাণাদিও এই পবিত্র গ্রন্থ থেকে নেয়া এবং এর আলোকেই তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। অর্থাৎ দাবিও তাই করেছি যা উল্লিখিত গ্রন্থ করেছে আর প্রমাণও তাই লিখেছি যার প্রতি সেই পবিত্র গ্রন্থ ইঙ্গিত করেছে। আমরা নিজেদের ধারণার বশবর্তী হয়ে কোন দাবিও করিনি আর কোন প্রমাণও লিপিবদ্ধ করিনি। এই বক্তব্য অনুসারে আমরা বিভিন্ন স্থানে সে সকল আয়াত উদ্ধৃত করেছি যা থেকে আমাদের প্রমাণাদি নেয়া হয়েছে আর যার সাথে আমাদের দাবির সম্পর্ক। সুতরাং যে ব্যক্তি আমাদের প্রমাণাদির মোকাবিলায় স্বীয় গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু লিখতে চায় বা কোন দাবি করে; তার জন্যও উল্লেখিত রীতি অনুসরণ করা আবশ্যক হবে।* অর্থাৎ তাদের গ্রন্থ এবং গ্রন্থে উল্লেখিত নীতির অনুকূলে দাবি ও প্রমাণ স্বীয় গ্রন্থ হতেই উপস্থাপন করতে হবে। এ স্থানে এটিও স্মরণ থাকে যে, দলীল বা প্রমাণ বলতে আমরা যৌক্তিক প্রমাণাদির কথা বলছি যা যুক্তিবাদী মানুষ নিজেদের

স্বীয় নীতির সত্যতা-সংক্রান্ত প্রমাণ উপস্থাপন করা ইলহামী গ্রন্থের জন্য আবশ্যক। কেননা এলহামী গ্রন্থের মর্যাদা কেবল এটি নয় যে, কোন ব্যক্তি এটি হতে (অর্থাৎ এটি থেকে) তোতা পাখির ন্যায় কিছু অযৌক্তিক ও অস্বাভাবিক কথা শিখে আত্মপ্রসাদ নিতে থাকবে যে, আমি এখন

দাবির সমর্থনে উপস্থাপন করে।

কোন গাঁথা, গল্প বা কাহিনী আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এক কথায় সকল বিষয়ে ইলহামী গ্রন্থে উল্লেখিত যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করা বাঞ্ছনীয়। নিছক ধারণার বশবর্তী হয়ে এমন কোন আনুমানিক বিষয় যেন উপস্থাপন না করে যার সত্যিকার মূল ঐশী গ্রন্থে পাওয়া যায় না। কেননা প্রত্যেক বিবেকবান জানে, ইলহামী হওয়ার দাবি করা এবং দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ দেয়া আর স্বীয় নীতি সমূহের সত্যতা স্পষ্ট প্রমাণাদির ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করা ঐশী গ্রন্থের নিজেরই দায়িত্ব। এমনটি যেন না হয় যে, ঐশী গ্রন্থ স্বীয় দাবি ও দাবির সমর্থনে যুক্তি প্রদানে সম্পূর্ণ নিরব এবং স্বীয় নীতিসমূহের সত্যতার কারণ উপস্থাপনে পুরো নিশ্চুপ থাকবে আর অন্য কেউ দাঁড়িয়ে তার পক্ষে ওকালতী করবে।

অতএব ভালভাবে স্মরণ থাকে যে, কোন ব্যক্তি নিজ গ্রন্থ ও স্বীয় নীতির সত্যতা এবং যথার্থতার পক্ষে যদি এমন কোন দাবি বা প্রমাণ উপস্থাপন করে যা তাঁর ধর্মীয় পুস্তক উপস্থাপন করেনি, তাহলে তার এই কর্ম এ বিষয়ের সুস্পষ্ট প্রমাণ ও সাক্ষ্য বলে গণ্য হবে যে, তার প্রিয় ও স্বীকৃত গ্রন্থ যাকে সে এলহামী বলে মনে করে, প্রতিযোগিতার এ শর্ত পূরণে অক্ষম।

চতুর্থতঃ সবার কাছে এটিও নিবেদন করছি যে, এ গ্রন্থ ভদ্রতা ও শালীনতার সকল দাবির নিরিখে লেখা হয়েছে। এতে এমন কোন শব্দ নেই যার ফলে কোন সম্মানিত ব্যক্তি বা কোন দলের দলপতির অসম্মান বা অবমাননা হতে পারে। প্রকাশ্যে বা ইশারা-ইঙ্গিতেও এমন কোন শব্দ প্রয়োগ করাকে আমরা চরম নোংরামী মনে করি।

এমন কাজ যে করে তাকে চরম দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ মনে করি। অনুরূপভাবে সকল ভদ্র শ্রোতার দৃষ্টিও এ দিকে আকৃষ্ট করা হচ্ছে যে, তাদের চেষ্টা-সাধনাও এ উদ্দেশ্যে নিবেদিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ তারা যদি আদৌ কিছু লেখেন, তাহলে ভদ্র ও সভ্য লোকদের রীতি অনুসারে পূর্ণ রচনার ভিত্তি হওয়া উচিত সভ্যতা-ভব্যতার ওপর। অসভ্য কথা-বার্তা,

---

মুক্তি পেয়ে গেছি। বরং ঐশী গ্রন্থের সঠিক কাজ হবে যৌক্তিক প্রমাণাদি উপস্থাপন করে বিশ্বাসকে এমন অক্ষয় ও নির্মল পর্যায়ে পৌঁছানো যা কোন সন্দেহ সৃষ্টিকারীর সন্দেহে বিলুপ্ত হতে পারে না, যাতে করে এই উৎকর্ষ বিশ্বাসের কল্যাণে বিশ্বাসীর সকল কর্ম, কথা ও বিশ্বাসের সংশোধন হয়ে যায় আর সততাকে সঠিক অর্থে সততা ও (আর) বক্রতাকে বক্রতা জ্ঞান করে প্রকৃত তাকওয়ার গুণে গুণান্বিত হতে পারে। কেননা মানুষ যতদিন অজ্ঞতারূপী জাহান্নামে পড়ে থাকে আর অন্ধ অনুকরণপ্রিয়তার ঈমানই যার সমূহ সম্বল। ঔদাসীন্য, ভ্রূক্ষেপহীনতা ও জাগতিকতার মোহের কারণে যাতে তার পূর্ণ বিশ্বাসও নেই, একইসাথে হৃদয়চক্ষুও যার অর্জন হয়নি, এমন মানুষ বড় আশংকার মাঝে জীবন কাটায়। তার অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হলো, কুরআনের আয়াত

وَمَنْ كَانَ فِيْ هٰذِهٖٓ اَعْمٰى فَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ اَعْمٰى وَاَضَلُّ سَبِيْلًا ﴿٧٣﴾

(সূরা বনী ইসরাঈল: ৭৩ অর্থাৎ যে ব্যক্তি এ জগতে অন্ধ সে পরজগতেও অন্ধই থাকবে বরং অন্ধদের চেয়ে অধঃপতিত। সুতরাং, যে গ্রন্থ স্বীয় সত্যতা ও স্বীয় নীতির সত্যতা প্রমাণ করে দেখায় না তা মানুষের জন্য প্রকৃত সৌভাগ্যের দ্বার উন্মোচন করতে পারে না।

আর জ্ঞান ও বুদ্ধির ক্ষেত্রে তাকে উন্নতও করে না বরং উন্নতির পথে বাঁধ সাধে এবং লাশের ন্যায় কেবল অন্ধ অনুকরণের গহ্বরে ঠেলে দেয়– যেখানে সে দেখেও না, শুনেও না আর বোঝেও না। যে ব্যক্তি এমন গ্রন্থাবলীর অনুসারী হয়ে থাকে, সে বিবেক-বুদ্ধি, যুক্তিলব্ধ অনুমান, চিন্তা-ভাবনা এবং প্রণিধানের সাথে কোন সম্পর্ক রাখে না বরং কেবল কেচ্ছা ও কাহিনীর ওপর নির্ভর করে আর বিষয়ের প্রকৃত তত্ত্বকথায় অবগাহনের চেষ্টা করে না। এছাড়া চিন্তাভাবনা ও প্রণিধান শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো ছেড়ে দিয়ে তার মাঝে ধনভান্ডারের ন্যায় গচ্ছিত বা অন্তর্নিহিত যেসকল যোগ্যতা ও সামর্থ্য রয়েছে জেনে-শুনে তা নষ্ট করে এবং ধীরে ধীরে কান্ডজ্ঞানহীন পশুর চেয়েও ঘৃণ্য পর্যায়ে পৌঁছে যায়। চূড়ান্ত পর্যায়ে যার সাথে মানুষের পূর্ণ মানবিকতার সম্পর্ক অর্থাৎ বুদ্ধি-বিবেক, যুক্তিলব্ধ অনুমান, চিন্তা-ভাবনা ও প্রণিধানের বৈশিষ্ট্য বা (এদরাক) বুৎপত্তি হতে রিক্তহস্ত হয়ে এতটা কান্ডজ্ঞানহীন হয়ে যায় যে, সে মানুষ আখ্যা পাওয়ার যোগ্যতাটুকুও হারিয়ে বসে। তার ভেতর যুক্তির নিরিখে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য করার আর যোগ্যতা বাকী থাকে না। তার বেলায় সেই উপমা আক্ষরিক অর্থেই প্রযোজ্য কুরআনে যার উল্লেখ আছে অর্থাৎ

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ۡ وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ؕ اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ؕ

সূরা আরাফ: ১৮০। অর্থাৎ যারা কেবল পিতা-পিতামহের অন্ধ অনুকরণে জীবন কাটায়। তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তা বোঝার জন্য কাজে লাগায় না, চোখও আছে কিন্তু দেখার কাজ নেয়া হতে সেগুলোকে অব্যাহতি দিয়ে রেখেছে, কানও আছে কিন্তু তাও অকেজো পড়ে রয়েছে। এরা পশুতুল্য বরং এর চেয়েও অধম। এককথায় মানব প্রকৃতিতে যে সকল শক্তি-বৃত্তি সুপ্ত রাখা হয়েছে ঐশীবাণীর অত্যন্ত প্রশংসনীয় ভূমিকা হলো, সেসবকে সবচেয়ে সঠিক ও যুক্তিযুক্তভাবে কাজে লাগানোর তাগাদা দেয়া, যেন কোন শক্তি নষ্ট না হয় বা এর অপ্রতুল ও অতিরিক্ত ব্যবহার যেন না হয় যা মানুষকে একান্ত প্রজ্ঞা ও যথার্থতার দাবির নিরিখে প্রদান করা হয়েছে।

এসকল শক্তির একটি হলো, বিবেক বা বুদ্ধি যার পরিপূর্ণতার মাঝে মানুষের সম্মান নিহিত আর এর যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমেই মানুষ প্রকৃত অর্থে মানুষ হয় আর স্বীয় পরাকাষ্ঠায় পৌঁছে। মোটের ওপর এটিই একমাত্র শক্তি বা বৃত্তি মানুষের হাতে রয়েছে যা তাকে অনন্ত উন্নতির জন্য দেয়া হয়েছে। তাই জানা কথা যে, ঐশী গ্রন্থ যদি এই বৃত্তির লালনকারী, সহায়ক ও রক্ষণাবেক্ষণকারী না হয় বরং এ শিক্ষা দেয় যে, এই বৃত্তিকে সম্পূর্ণভাবে পরিত্যক্ত হিসেবে ছেড়ে দেয়া উচিত; তাহলে এমন গ্রন্থ মানুষের প্রকৃতিগত শক্তি-বৃত্তিকে সঠিক খাতে পরিচালিত না করে এর বিকাশের পথে অন্তরায় হবে। এর সহায়ক ও সাহায্যকারী হওয়ার পরিবর্তে স্বয়ং দস্যুবৃত্তি ও বিভ্রান্তকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবে। এমনক্ষেত্রে এর মাধ্যমে যা কিছু শেখা ও বুঝা যাবে তা এমন কিছু নয় যাকে জ্ঞান ও প্রজ্ঞা বলা যেতে পারে, বরং তা হীন আশা, অযৌক্তিক বিশ্বাস, হীন বাসনারই নামান্তর ও কল্প-কাহিনীরই স্তূপ হবে। এর অন্ধ অনুকরণকারীরা উন্মাদ ও সন্দেহবাদীদের ন্যায় কোন ফসল না লাগিয়ে কাল্পনিক ফসল ঘরে ওঠানোর দুরাশা পোষণ করে! তাই জানা কথা যে, এমন গ্রন্থ যার নীতিমালার সফলতা নির্ভর করে বিবেক-বুদ্ধি ও যুক্তির বিনাশের ওপর তা কোনভাবেই মানুষের হিতসাধন করতে পারে না। লেখক

অবমাননাকর ভাষা এবং পবিত্র লোক ও নবী-রসূলদের অসম্মান থেকে যেন তা সম্পূর্ণভাবে মুক্ত থাকে। ধর্মীয় বই-পুস্তক লিখার দায়িত্ব অত্যন্ত স্পর্শকাতর একটি কাজ। এক্ষেত্রে ক্ষমতার বাগডোর কেবল এক ব্যক্তির হাতে থাকে না বরং প্রত্যেক সুন্দর ও কুৎসিতের মাঝে পার্থক্যকারী, ন্যায়পরায়ণ এবং বিদ্বেষী আর নৈরাজ্যবাদী ও সত্যভাষীর মাঝে পার্থক্যকারী ব্যক্তি অতি কাছে থেকে তাদের পর্যবেক্ষণ করছে।

এমন ভদ্রমানুষ কমবেশি সকল ধর্মেই রয়েছে যারা দুস্কৃতিমূলক ও অশালীন বক্তৃতাকে প্রকৃতিগতভাবেই ঘৃণা করেন। বিভিন্ন ধর্মের পবিত্র পথপ্রদর্শকদের অশালীন ও অসম্মানজনকভাবে স্মরণ করাকে তারা চরম নোংরামী ও দুষ্কৃতি গণ্য করেন। প্রকৃতপক্ষে সত্য কথাও এটি – যেসব পবিত্র মানুষকে খোদা তা'লা স্বীয় বিশেষ প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার অধীনে বিভিন্ন জাতির অনুসরণীয় নেতা নিযুক্ত করেছেন, যেসব আলোকিত ব্যক্তিবর্গকে পৃথিবীতে পাঠিয়ে এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে স্বীয় ইবাদত ও একত্ববাদের জ্যোতিতে আলোকিত করেছেন আর যাদের বলিষ্ঠ শিক্ষার কল্যাণে সকল নোংরামীর মূল তথা শিরক ও সৃষ্টিপূজা পৃথিবীর অধিকাংশ স্থান থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, এক খোদার স্মরণরূপী বৃক্ষ যা ছিল শুষ্ক তা পুনরায় সতেজতা ও সৌন্দর্যে ভরে যায়, খোদার ইবাদতের অট্টালিকা যা ধ্বসে পড়ে ছিল তা পুনরায় এর দৃঢ় ভিত্তির ওপর নির্মাণ করা হয়, যেসকল গৃহিত জনে খোদা স্বীয় বিশেষ স্নেহের ছায়ায় স্থান দিয়ে এমন বিস্ময়করভাবে সমর্থন করেছেন যে, তাঁরা কোটি কোটি বিরোধীর ভয়ে ভীতও হননি, ক্লান্ত-শ্রান্তও হননি, তাদের কাজে কোন ভাটা পড়েনি যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সততাকে সকল দুস্কৃতকারীর প্রতিরোধের তোয়াক্কা না করে ধরাপৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছেন– খোদার এমন প্রিয়ভাজনদের সম্পর্কে বড় বড় কথা বলা চরম নোংরামী, অথর্বতা ও হঠকারিতার শামিল।

যে ব্যক্তি উজ্জ্বল সূর্যকে লক্ষ্য করে থুথু ফেলে, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের সেই থুথু তার নিজের মুখেই পড়ে। এমন ব্যক্তির চেহারা কিয়ামত পর্যন্ত অভিশপ্তই থাকবে। পবিত্ররা তার দুর্গন্ধ হতে নিরাপদ দূরত্বে থাকবেন।

এখানে আমি ভদ্রতা, শিষ্টাচার ও জিহ্বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে যে উপদেশ দিচ্ছি তা অকারণে নয় বা বিশেষ উদ্দেশ্য ছাড়া নয়। এখন আমার অনেক এমন ব্যক্তির কথা মনে পড়ছে যারা নবী-রসূলদের অসম্মান করে মনে করে যে, অনেক বড় পুণ্যের কাজ করছে।

এমন ভদ্রতাপূর্ণ বাক্যাবলী লিখে থাকে যার মাধ্যমে তাদের স্বভাবগত পবিত্রতা খুব ভালভাবে প্রকাশ পেয়ে যায়। আমি ভালভাবে খতিয়ে দেখেছি, এসকল হীন আচরণেরও দু'টো কারণ আছে। কিছু লোক যারা প্রজ্ঞাপূর্ণ ও যুক্তিসঙ্গত কথা বলার যোগ্যতা রাখে না তারা যখন কোন সত্যের অনুসারী ব্যক্তির যুক্তি ও বাকরুদ্ধকর কথা শুনে দিশেহারা ও নির্বাক হয়ে যায় তখন জ্ঞানগর্ভ আলোচনাকে হাস্যকর আখ্যা দেয়ার মাধ্যমেই নিজেদের মুখ রক্ষার চেষ্টা করে। অন্য কোনভাবে না পারলেও অন্তত পক্ষে এভাবে সমমনাদের মাঝে প্রশংসিত হওয়ার চেষ্টা করে। অতএব এমন মানুষ যারা জাতির শিক্ষক সেজে বসেছে, নিজেদের এই অলীক শ্রেষ্ঠত্বকে বজায় রাখার জন্য কথায় কথায় তাদের হঠকারিতার আশ্রয় নিতে হয় আর সাধারণ মানুষ থেকে বেশি বিদ্বেষ প্রদর্শন করতে হয়। সত্য বলতে কি এমন লোকদের জন্য আক্ষেপ করেও লাভ নেই কেননা, অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ তাদের সকল দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে। তারা না খোদাকে ভয় করে আর না ঈমান, সত্য ও সততার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করে, বরং তারা বস্তুজগতের নোংরা কামনা-বাসানার পিছনেই ছুটে। যেখানে খোদাকে নিয়ে তাদের কোন মাথা ব্যথা নেই আর যাদের লজ্জা-শরম এর কোন বালাই নেই, সত্য গ্রহণ করা যাদের কাছে আদৌ পছন্দনীয় নয় তারা এমতাবস্থায় গালমন্দ ছাড়া আর কী-ই বা করতে পারে। অপলাপ করা ছাড়া তাদের আর কি-ই বা যোগ্যতা আছে? তারা কী-ই বা বলবে আর লিখবেই বা কী? যাদের সভ্যতা-ভব্যতা ও গবেষণার সাথে কোন সম্পর্ক নেই এমন লোকদের বাদ দিলেও খৃষ্টানদের মাঝে এখনও সহস্র সহস্র এমন মানুষও রয়েছে যারা ভদ্র ও ন্যায়পরায়ণ আর যারা সততার সাথে ইসলামের মাহাত্ম্য স্বীকার করেছেন এবং ত্রিত্ববাদের ভ্রান্তি ও বহু বিদাত যে খৃস্টধর্মের অংশ হয়ে গেছে তা নিজেদের রচনাবলীতে দ্ব্যর্থহীনভাবে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, আমাদের স্বদেশী আর্যদের এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে যাচ্ছে। বিদ্বেষ এ জাতিকে এতটা পরিবেষ্টন করে রেখেছে যে, সম্মানের সাথে নবীদের নাম উচ্চারণ করাকে তারা পাপ মনে করে আর নবীকুলের সম্মানহানী করে এবং সবাইকে মিথ্যাচারী ও প্রতারক আখ্যা দিয়ে প্রমাণশূণ্য এই দাবি করে যে, একমাত্র বেদ-ই খোদার বাণী।

ভাষান্তর: **মওলানা ফিরোজ আলম**
মুরব্বী সিলসিলাহ্

সাধারণ খ্রিষ্টানরাও এই আপত্তির উর্ধ্বে নয়। খাতামুল আম্বিয়া (সা.)-এর বিরুদ্ধে তাদের হৃদয়ে যে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ রয়েছে তাতো আছেই, অধিকন্তু একমাত্র হযরত ঈসা (আ.)- ছাড়া অন্য কোন নবীর প্রতি যেমন সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ প্রদর্শন করা উচিত তারা আদৌ তা প্রদর্শন করেনা। বরং এক ব্যক্তি যখন বাপ্তাইজ হয়ে (বয়আত করে) হযরত ঈসা (আ.)-কে খোদার বিশেষ পুত্র জ্ঞান করে তখনই অন্য নবীদের সম্পর্কে তার মুখ লাগামহীন হয়ে যায়।

বিশেষ করে (ইঞ্জিলে) যে লেখা রয়েছে, হযরত ঈসা (আ.)-এর পূর্বে যত নবী এসেছেন তাদের সকলেই ছিলেন চোর ও ডাকাত– এমনসব বাক্য তাদের অনেকটা ধৃষ্ট বা নষ্ট করেছে। কিন্ত এই অহংকার-সূচক শব্দ কোনভাবে কোন নেক ও পবিত্র মানুষের প্রতি আরোপিত হতে পারে না। হযরত ঈসা (আ.) খোদার এমন বিনয়ী, কোমলমতি ও নিঃস্বার্থ বান্দা ছিলেন যে, কেউ তাঁকে নেক বলবে– এই অনুমতিও তিনি দেননি। তাই এমন শব্দ যাতে নিজের অহংকার ও অন্যের অসম্মান নিহিত, তা তাঁর প্রতি কী করে আরোপিত হতে পারে? খোদার নবীদের যদি আমরা চোর ও ডাকাত বলি, তাহলে আমরা চোর ও ডাকাতদের তুলনায় যে হাজারগুণ বেশি নিকৃষ্ট তাতে কোন সন্দেহ নেই। যেসকল হৃদয়ে খোদার পবিত্র বাণী অবতীর্ণ হয়েছে তাঁরা যদি পবিত্র না হয়ে থাকেন তাহলে অপবিত্রের সাথে পবিত্রের কী সম্পর্ক?খোদার মনোনীতদের জন্য অসৌজন্যমূলক বা অশালীন শব্দ ব্যবহার করা বড়ই দুঃখজনক একটি বিষয়।

(চলমান টিকা পরবর্তী সংখ্যায়)

জুমুআর খুতবা

"আমাদের এখন অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একটি করে হলেও বিশেষভাবে ৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০টি রোযা রাখা উচিত। আর দোয়া করুন, নফল পড়ুন এবং সদকা দিন।"

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১২ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۝ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ إِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۝
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۝

তাশাহুদ, তাঊয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর বিভিন্ন খুতবা এবং বক্তৃতায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত বিভিন্ন শিক্ষণীয় গল্প-কাহিনী তুলে ধরেন যা আমি বিভিন্ন সময় উপস্থাপন করে আসছি। আজও একই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তাঁর এক খুতবায় এ বিষয়টি বর্ণনা করেন যে, 'খোদা তা'লা যখন কাউকে দন্ডায়মান করেন অথবা যখন নবীদের প্রেরণ করেন তখন তিনি তাদের সাহায্য এবং সমর্থনও করে থাকেন। আর সত্য প্রকাশের জন্য পৃথিবীর বিশাল জনগোষ্ঠীকেও যদি তাদের অপকর্মের জন্য

শাস্তি দিতে চান তাহলে শাস্তি দেন, ভ্রুক্ষেপ করেন না’। এই প্রেক্ষাপটে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.) হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণিত একটি কাহিনীর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, শৈশবে আমাদের গল্প শোনার সুগভীর আগ্রহ ছিল। আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে অনুরোধ করলে তিনি আমাদের এমন সব গল্প বলতেন যা শুনে শিক্ষা অর্জন হয়। সেসব কাহিনীর মাঝে একটি কাহিনী এখন আমার মনে পড়ছে যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মুখে আমি শুনেছি। তিনি (আ.) বলতেন, হযরত নূহ্ (আ.)-এর যুগে এ কারণে প্লাবন এসেছিল যে, মানুষ তখন চরম নোংরামিতে লিপ্ত ছিল আর পাপাচারে ছিল জর্জরিত। ক্রমাগতভাবেতাদের পাপের মাত্রা বৃদ্ধির পাশাপাশি আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে তাদের মূল্যও হারিয়ে যেতে থাকে।এটি একটি কাহিনী। কোন পাহাড়ের চূড়ায় একটি গাছ ছিল। সেই গাছে ছিল একটি পাখির বাসা। সেই বাসায় ছিল এক চড়ুই ছানা । সেই ছানার মা কোন জায়গায় গিয়েছে কিন্তু কোন কারণে আর ফিরে আসতে পারেনি। হয়তো মারা গিয়ে থাকবে বা অন্য কোন কারণে তার ফিরে আসা হয়নি।

এই চড়ুই ছানার পিপাসা লাগে এবং পিপাসায় কাতর হয়ে সে নিজের মুখ খুলতে থাকে। এটি দেখে আল্লাহ্ তা’লা ফিরিশ্‌তাদের নির্দেশ দেন, যাও পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষণ কর আর এত পরিমাণ বৃষ্টি বর্ষণ কর যেন সেই পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত বৃক্ষস্থপাখির বাসা পর্যন্ত পানি পৌঁছে যায়, যাতে সেই চড়ুই ছানা পানি পান করতে পারে। ফিরিশ্‌তারা বলে, হে আল্লাহ্! সেই পর্যন্ত পানি পৌঁছাতে গেলে সারা পৃথিবীই তলিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ্ তা’লা উত্তর দেন, আমি পৃথিবীর ভ্রুক্ষেপ করি না, এখন আমার দৃষ্টিতে পৃথিবীর মানুষের ততটাও মূল্য নেই যতটা এই চড়ুই ছানার রয়েছে।

অতএব যদিও এটি একটি কাহিনী কিন্তু এই কাহিনীতে শিক্ষণীয় দিক হলো, সত্য এবং সততা বিবর্জিত গোটা বিশ্বের সবাই সম্মিলিতভাবেও খোদার দৃষ্টিতে ততটা মূল্যও রাখে না যতটুকু এক চড়ুই ছানার রয়েছে। অতএব আজ এই কাহিনী থেকে আমরা যেখানে একথা শিখতে পারি যে, সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকা উচিত সেখানে আমাদের নিজেদেরওআত্মবিশ্লেষণ করা উচিত। কারণ আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে মেনেছি ধর্মকে জাগতিকতা বা পার্থিবতার উপর প্রাধান্য দেয়ার জন্য, নিজেদের আভ্যন্তরীণ পাপ-পঙ্কিলতা দূরীভূত করার জন্য এবং পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার জন্য।

কিন্তু কালের প্রবাহে আমাদের উন্নতির পরিবর্তে যদি অবনতি হয়, আমরা যদি অধঃপতনের দিকে যাই তাহলে আমরা আমাদের লক্ষ্য থেকে অনেক দূরে ছিটকে পড়ব। এমন পরিস্থিতিতে খোদাও আমাদের প্রতি আর ভ্রুক্ষেপ করবেন না। অনুরূপভাবে একথাও কারো অজানা নয়, আজ পৃথিবীর অবস্থা কোন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে। বহু দেশে সরকার এবং জনসাধারণের কেউই পরস্পরের অধিকার প্রদান করে না এবং সেখানে অশান্তি ও নৈরাজ্য বিরাজমান রয়েছে। যেখানে বাহ্যতঃ অশান্তি এবং নৈরাজ্য দেখা যায় না বা অবস্থা যেখানে খুব একটা অধঃপতিত বলে মনে হয় না সেখানেও খোদার ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে, মানুষ শুধু খোদা থেকে দূরেই যাচ্ছে না বরং আল্লাহ্ তা’লার বিরুদ্ধে বাজে কথা বলে এবং অপলাপ করে তাঁর অবমাননা করা হচ্ছে একইসাথে নোংরামিতে তারা এতটাই নিমজ্জিত হচ্ছে যে, অস্বাভাবিক কার্যকলাপ বা চরিত্র বিবর্জিত কার্যকলাপকে আইন পাশ করে সেখানে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা চলছে। বরং বলা হয়, যারা এসব নোংরা কাজের সমর্থন করে না আইনের দৃষ্টিকোণ থেকে তারা অপরাধি। ভূমিকম্প, ঝড়, তুফান, নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা এবং প্রবল বর্ষণ যে ধ্বংসযজ্ঞ সৃষ্টি করে রেখেছে এর কারণ হলো, পাপ চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

এটি কেবল সতর্কবাণী মাত্র, আল্লাহ্ তা’লা মানুষকে সাবধান করছেন। তাই এ দৃষ্টিকোণ থেকে আহমদীদের কাঁধে পৃথিবীবাসীকে সতর্ক করার এবং একথা বলারগুরুভার বর্তায় যে, তারা যদি সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ না করে তাহলে আল্লাহ্ তা’লা অনেক ধ্বংসাত্মক বিপদাপদ পৃথিবীতে নাযিল করতে পারেন। পৃথিবীবাসী কান্ডজ্ঞান খাটাবে, এ দোয়াই আমাদের আল্লাহর কাছে থাকবে।

এরপর আমরা দেখি, আজকালকার বরং চিরাচরিত রীতি যা চলে আসছে তাহলো,মানুষ নিজের অধিকার দাবি করে, এর ফলে অন্যের যত ক্ষতিই হোক না কেন। এ সম্পর্কে একজন প্রকৃত মুসলমানের চিন্তাধারা কেমন হওয়া উচিত সে সংক্রান্ত একটি ঘটনা এবিষয়ে সর্বোত্তম পথের দিশারী। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) শোনাতেন, একজন সাহাবী নিজের ঘোড়া বিক্রির উদ্দেশ্যে অন্য একজন সাহাবীর কাছে নিয়ে যান আর দৃষ্টান্তস্বরূপ এর মূল্য নির্ধারণ করেন দু’শত রুপি। দ্বিতীয় সাহাবী তখন বলেন, আমিএত কম মূল্যে এ ঘোড়া ক্রয় করতে পারি না কেননা এর মূল্য এরচেয়ে বেশী। সেই সাহাবী বিক্রেতা সাহাবীকে বলেন, ঘোড়ার বাজারদর সম্পর্কে আপনি মনে হয় অবহিত নন। কিন্তু ঘোড়ার মালিক সাহাবী এরচেয়ে বেশি মূল্য নিতে অস্বীকার করেন, তিনি বলেন, আমার ঘোড়ার মূল্য যেখানে এর বেশি নয় সেখানে আমি কেন এর চেয়ে বেশি মূল্য গ্রহণ করবো। এটি নিয়ে তাদের মাঝে বিতর্ক হতে থাকে। অবশেষে তারা শালিসের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত করান। এটি ছিল সেই ইসলামিক চেতনা এবং প্রেরণা যা এই দু’জন সাহাবী প্রদর্শন করেছেন। ইসলামী শিক্ষা হলো, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের অধিকার নেয়ার পরিবর্তে বা অধিকার দাবি করতে গিয়ে নাছোড় মনোবৃত্তি প্রদর্শনের পরিবর্তে অন্যের অধিকার প্রদানের ব্যাপারে সচেষ্ট হওয়া।

এই চেতনাবোধ জাগ্রত হলে হরতাল বা ধর্মঘট আপনা-আপনিই বন্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর এই বক্তৃতার সময় স্ট্রাইক বা ধর্মঘটচলছিল। তিনি বলেন,নূন্যতম নেকী হলো, কারো পক্ষ থেকে যখন অধিকারের প্রশ্ন উঠে তখন তার প্রাপ্য অধিকার তাকে প্রদান করা উচিত। এটি অ-ইসলামিক মনোবৃত্তি যে, অন্যের অধিকার যেহেতু আমরা দীর্ঘকাল থেকে কুক্ষিগত করছি, ভোগ করছি, আর একে নিজের অধিকার মনে করার এক মনোবৃত্তি আমাদের মাঝে গড়ে উঠেছে তাই অন্যের প্রাপ্য আমরা তাকে দিতে পারি না। এটি খুবই ভ্রান্ত একটি রীতি যা সম্পূর্ণরূপে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী।

আজকালকার উন্নত বিশ্বেও হরতাল বা ধর্মঘটের অধিকার দেয়া হয়েছে, তারাও কান্ডজ্ঞান না খাটিয়েই এর প্রয়োগ করে আর এই চিন্তা করে না যে, এর সীমা-ফলাফল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ আজকাল যুক্তরাজ্যেজুনিয়র ডাক্তারদের ধর্মঘট চলছে যার ফলে রোগীরা চরমদুর্ভোগের শিকার হচ্ছে। নিজেদের অধিকার আদায়ের নামে রোগীদের শুধু চিকিৎসা সুবিধা থেকেই বঞ্চিত করা হচ্ছে না বরং কোন কোন ক্ষেত্রে তাদের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, এবারকার জাপান সফরের সময় খুবই ভদ্র একজন খ্রিস্টান পার্দ্রি আমাকে প্রশ্ন করেন, শান্তির সংজ্ঞা কী?কীভাবে তা প্রতিষ্ঠা করা যায়? আজ পর্যন্ত আমি এই প্রশ্নের সন্তোষজনক কোন উত্তর পাইনি, আমি তাকে বললাম, আমি পূর্বেও একথা বলেছি, ইসলাম বলে যা নিজের জন্য পছন্দ কর অন্যের জন্যও তা-ই পছন্দ কর। যদি এমনটি কর তাহলে তোমরা পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করবে। আর অধিকার যদি এভাবে নিশ্চিত কর তাহলে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, এভাবে তোমরা পরস্পরের প্রতি শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা দেবে। তিনি বলেন, এই সংজ্ঞা আমার খুবই পছন্দ হয়েছে যা আমি প্রথমবার শুনেছি।

অতএব আজ কেবল ইসলামই সকল বিষয়ে সঠিক পথ-প্রদর্শন করতে পারে কিন্তু এর ব্যবহারিক দৃষ্টান্ত স্থাপন করা ছাড়া আমরা জগদ্বাসীকে কোনভাবেই মানাতে সক্ষম হব না। অন্যের অধিকার কুক্ষিগত করার তো প্রশ্নই উঠে না। আমরা যদি নিজেদের বৈধ অধিকার ছেড়ে দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাই কেবল তবেই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে আর শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এমনটি করা উচিত। আমরা বৈধ অধিকারও যদি ছেড়ে দেই তাহলে কিছুই যায় আসে না। যদি এমনটি হয়অর্থাৎ সমাজে যেহেতু উভয় পক্ষ থেকে অধিকার প্রদানের চেষ্টা থাকবে তাই দ্বিতীয় পক্ষও মু'মিন হওয়ার কারণে অবৈধভাবে অন্যের অধিকার পদদলিত করার চেষ্টা করবে না, হতেই পারে না যে, সে অবৈধভাবে অধিকার কুক্ষিগত করবে।

কিন্তু পরিতাপের বিষয় হলো, অনেক সময় আমাদের কাযা বা বিচার বিভাগে এমন অনেক মোকদ্দমা বা মামলা আসে যে, ভাই-ভাইয়ের অধিকারকে পদদলিত করে বা অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনের প্রাপ্য অধিকারকে তারা কুক্ষিগত করে। আমরা যদি এদিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করি তাহলে আমাদের বিচার বিভাগের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা। ঝগড়া-বিবাদ নিরসনের জন্য ইসলাম কি শিক্ষা দেয়, ইসলামী চিন্তা চেতনা কেমন হওয়া উচিত, সাহাবীদের কেমন আদর্শ আমাদের সামনে রয়েছে? ইতিহাসে উল্লেখ আছে, একবার হযরত ইমাম হাসান এবং হোসেন (রা.)-এর মাঝে কোন বিষয়ে বিতর্ক হয়। ভাইয়ে ভাইয়ে অনেক সময় মনোমালিন্যের ঘটনা ঘটেই থাকে বা বিতর্ক হয়ে যায়।

প্রকৃতিগতভাবে হযরত ইমাম হাসান খুবই শালীন ও কোমলমতী ছিলেন কিন্তু হযরত ইমাম হোসেন-এর স্বভাবে আবেগপ্রবণতার প্রাধান্য ছিল। তাদের মাঝে যে বাকবিতন্ডা বা ঝগড়া হয় তাতে হযরত ইমাম হোসেনের পক্ষ থেকে অধিক কঠোরতা প্রদর্শিত হয় কিন্তু হযরত ইমাম হাসান ধৈর্য প্রদর্শন করেন। সেই বাকবিতন্ডার সময় অন্যান্য সাহাবীরাও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন। ঝগড়া যখন শেষ হয়, পরবর্তী দিন একজন দেখেন যে, হযরত ইমাম হাসান খুব দ্রুত পায়ে কোন দিকে ছুটে যাচ্ছেন। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

হযরত ইমাম হাসান বলেন, আমি হোসেনের কাছে ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি। সেই ব্যক্তি বলেন, আপনি কেন ক্ষমা চাইতে যাচ্ছেন? ঝগড়ার সময় আমিও অকুস্থলে উপস্থিত ছিলাম। আমি জানি হোসেন আপনার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। আপনার তার কাছে নয় বরং তার আপনার কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত। হযরত ইমাম হাসান বলেন, আপনি ঠিক বলছেন, আমি ক্ষমা চাইতে যাচ্ছি এই জন্য যে, এক সাহাবী আমাকে বলেছেন, একবার মহানবী (সা.) বলেন, দু'জনের মাঝে যখন ঝগড়া হয় তখন তাদের মাঝে যে প্রথমে মিমাংসার হাত বাড়ায় সে দ্বিতীয় জনের চেয়ে পাঁচশ' বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। এটি শুনে আমার হৃদয়ে এই প্রেরণা জাগ্রত হয় যে, গতকাল আমি হোসেনের কঠোর ব্যবহারের সম্মুখীন হয়েছি, তিনি আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করেছেন। এখন হোসেন যদি আমার কাছে ক্ষমা চাওয়ার জন্য প্রথমে এসে যায় আর মিমাংসা করেন তাহলে উভয় জগতেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হলাম। এখানেও আমার সাথে কঠোর ব্যবহার করা হলো আর পরকালেও আমি পিছিয়ে থাকলাম। তাই আমি এই সিদ্ধান্ত করেছি, যেই কঠোর ব্যবহারের সম্মুখীন আমি হয়েছি তাতো হয়েছি-ই, এখন আমি তার কাছে প্রথমেই ক্ষমা চেয়ে নিব যেন এর বিনিময়ে তার পাঁচশ' বছর পূর্বে আমি জান্নাত লাভ করতে পারি। অতএব এহলো সেই মনমানসিকতা যা আমাদের মাঝে সৃষ্টি হওয়া উচিত বা জাগ্রত হওয়া উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে আমি একটি কৌতুক শুনেছি যা মোকামাতে হারীরি বা অন্য কোন গ্রন্থ হতে নেয়া একটি কাহিনী। তিনি (আ.) বলতেন, কোন জায়গায় কোন একজন অতিথি গোসল করতে যান। হামামের মালিক অতিথিদের সেবার জন্য বিভিন্ন চাকর-বাকরনিয়োজিত রেখেছিলেন। সেসব দেশে এমন হামাম বা স্নানাগার থেকে থাকে যেখানে অতিথিদের মালিশ করার জন্য সেবকদের ব্যবস্থা থাকে যারা মানুষকে গোসলও করায়। তিনি বলেন, দৈবক্রমে তখন হামামের মালিক সেখানে উপস্থিত ছিলো না। মেহমান যখন গোসল করার জন্য হামামে প্রবেশ করে তখন সবসেবক একত্রে এসে তার সাথে চিমটে যায়। মাথা যেহেতু সহজেই মালিশ করা সম্ভব তাই সবাই একসাথে তার মাথা মালিশ করতে আরম্ভ করে। একজন বলে, এটি আমার মাথা, দ্বিতীয় জন বলে, না আমার মাথা। এভাবে একথা নিয়ে ঝগড়া-বিবাদ আরম্ভ হয়ে যায়। তখন একজন আরেকজনকে ছুরিকাঘাত করে যারফলে সে আহত হয়। হৈ-চৈ এর ফলে পুলিশ আসে। অবশেষে বিষয়টি আদালত পর্যন্ত গড়ায়। আদালতেও একজন চাকর বলে, এটি আমার মাথা আর দ্বিতীয় জন বলছিল, এটি আমার মাথা ছিল। যে গোসল করতে গিয়েছিল আদালত তাকেজিজ্ঞেস করে। তখন সে বলে, হুযূর! এদের তো মাথা নেই অর্থাৎ কোন বোধবুদ্ধি নেই। এদের কথা শুনে আমার আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো, আপনিও আমাকে একই প্রশ্ন করলেন। অথচ মাথা এরও নয় আর ওরও নয় মাথা তো ছিল আমার।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই দৃষ্টান্ত এজন্য দিতেন যে, এই ইহজাগতিক ঝগড়া-বিবাদ অর্থহীন। আমারই বা কী আর তোমারই বা কী, গোলাম বা দাস তো কিছুই নয়, সে যখন আমি আবদুল্লাহ্ হওয়ার দাবি করেতখন এর অর্থ হয়, এখন তার নিজের আর কিছুই নেই। একজন প্রকৃত মুসলমানের আচার-আচরণ কেমন হওয়া উচিত সে সম্পর্কে বলা হচ্ছে, আর এই ঘটনা সেই প্রেক্ষাপটেই তিনি বর্ণনা করছেন।

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র বান্দা হয়ে থাকে সে আমার এবং তোমার প্রশ্ন উঠায় না, সে তো খোদা তা'লার বান্দা হয়ে থাকে। আব্দুল্লাহ্ যে হয় তার নিজের বলতে কিছুই থাকে না, সব খোদা তা'লার হয়ে থাকে। সে যখন প্রকৃত মু'মিন হয়ে যায়, আব্দুল্লাহ্ যখন হয়ে যায় তখন সে বলে, সবকিছু আল্লাহ্‌র। এখন তার নিজের যেহেতু আর কিছুই নেই তাই এরপর আমার এবং তোমার এই বিতন্ডার বা বিতর্কের আর সুযোগ থাকে না। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কুরআন পাঠ করে দেখ! এতে মহানবী (সা.)-এর নামও আব্দুল্লাহ্ রাখা হয়েছে। যেভাবে কুরআনে বলা আছে 'লাম্মা কামা আব্দুল্লাহ্' (সূরা আল্‌জিন্ন: ২০)।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার বান্দা হিসেবে আমাদের নিজেদের আর কিছুই থাকে না, সবই আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। এ কারণেই পবিত্র কুরআনে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে, আমরা মু'মিনদের কাছ থেকে তাদের প্রাণ এবং সম্পদ ক্রয় করে নিয়েছি। এখানে বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন সবাই প্রাণ শব্দের অধীনে চলে আসে আর বাকি সব ধন-সম্পদ আসে মাল শব্দের অধীনে। মানুষ এই দু'প্রকার জিনিসেরই মালিক বা সত্ত্বাধিকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমরা এই উভয় জিনিস মানুষের কাছ থেকে ক্রয় করে নিয়েছি, তাদের প্রাণও নিয়েছি আর সম্পদও।

এর অর্থ হলো, তোমাদের মাঝে এমর্মে ঝগড়া-বিবাদ থাকা উচিত নয় যে, এই জিনিসটি আমার বা সেই জিনিসটি তার, এই বিতন্ডায় লিপ্ত হয়ো না কেননা;এখানে আমার তোমার বলার কোন সুযোগ নেই। তোমরা নিজেদের গন্তব্যে পৌঁছার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা কর আর এসব বিতর্ক ছেড়ে দাও যে, অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট হলেন অমুক ব্যক্তি কেন হলেন না। এখানে নির্বাচনের কথা হচ্ছে, ওহ্দাদারদের কথা বলা হচ্ছে। অনেকেই এই ঝগড়া আরম্ভ করে যে, অমুক ব্যক্তি কেন নামাযের ইমাম নিযুক্ত হলো, আমরা তার পিছনে নামায পড়ব না বা অমুক ব্যক্তি কেন প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হলো, অমুক কেন হয়নি? অমুক কেন সেক্রেটারী মনোনীত হলো আমি কেন হলাম না বা যতক্ষণ পর্যন্ত অমুক ব্যক্তি ইমাম না হবেন আমরা অমুকের পিছনে নামায পড়তে পারি না। এ কথাগুলো কেবল শোনার জন্য নয়।

কেউ কেউ হয়তো ভাববেন, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর যুগে এমন মানুষ ছিল, বর্তমান যুগে আর এমন মানুষ নেই। আজও এমন অভিযোগ এসে থাকে। সেযুগে সাহাবীরাও জীবিত ছিলেন যারা এমন বক্র প্রকৃতির লোকদের সংশোধন করতেন। কিন্তু আমরা নবুওয়তের যুগ বা নবীর যুগ থেকে এখন ক্রমশঃ দূরে যাচ্ছি আর ভবিষ্যতে এই দুরত্ব আরো বৃদ্ধি পাবে।

তাই এদিকে আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হওয়া উচিত। পূর্বেও এ বিষয়ের প্রতি আমি আপনাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছি যে, আমাদের অনেক সতর্ক থাকা উচিত। আমাদের একথা পূর্বের চেয়ে অনেক বেশি বোঝার প্রয়োজন রয়েছে যে, আব্দুল্লাহ্ হিসেবে আমরা আমাদের দায়িত্ব কীভাবে পালন করতে পারি, কীভাবে নিজেদের হঠকারিতা এবং আমিত্বকে বিসর্জন দিয়ে খোদার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে পারি? নির্বাচনের সময়ও এমন প্রশ্নাবলী উঠে থাকে। যখন কোন সময় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত দেয়া হয়, তখন মানুষ এমন প্রশ্নের অবতারণা করে। এই বছরটি আমাদের জামাতে নির্বাচনের বছর। এ বছর নির্বাচন হবে।

অতএব এ দৃষ্টিকোণ থেকে সবার উচিত নিজেদের চিন্তা-ধারার সংশোধন করা। দোয়ার পর সকল প্রকার সম্পর্ক এবং আত্মীয়তাকে ভুলে গিয়ে নিজেদের নির্বাচনের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করুন, এরপর যে সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তা সানন্দে গ্রহণ করুন। সম্পূর্ণরূপেআমিত্ব বা স্বার্থের উর্ধ্বে থেকে সিদ্ধান্ত করুন। অঙ্গ সংগঠনগুলোর ক্ষেত্রেও এমন প্রশ্ন সামনে আসে। মাত্র দু'দিন পূর্বেই কোন একটি দেশের লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র নির্বাচন হয়, সেখান থেকে আমার কাছে পত্র আসে, অমুককে কেন মনোনীত করা হলো, অমুককে কেন করা হলো না, সে এমন বা তার ভেতর অমুক অভ্যাস রয়েছে। অতএব এমন আজেবাজে চিন্তাধারা থেকে আমাদের দূরে থাকা উচিত। একটি নির্দিষ্ট কাল বা সময়ের জন্য যার অনুকূলেই মঞ্জুরী দেয়া হয় তার সাথে পুরোপুরি সহযোগিতা করা উচিত বা সবার পূর্ণ সহযোগিতা তার প্রতি থাকা উচিত।

আরেকটি কথার প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, মু'মিনের উচিত দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে চেষ্টা করা এবং বিষয়কে চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছানো। কর্মকর্তা হোক বা কোন ওহ্দাদার হোক অন্যদের ওপর নির্ভর করার পরিবর্তে অর্থাৎ কর্মকর্তারা যেন কেবল অধীনস্তদের ওপরই নির্ভর না করেন বরং তাদের নিজেদেরও সরাসরি সব কাজের নিগরানী এবং তত্ত্বাবধান করা উচিত, কাজে জড়িত থাকা উচিত, তাহলেই কাজ সঠিকভাবে সমাধা হওয়া সম্ভব।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এক সম্পদশালী ব্যক্তি ছিল। তার বিশাল এক লঙ্গরখানা ছিল। গরীবদের একটি বিশাল শ্রেণী প্রতিদিন সেখান থেকে খাবার খেত কিন্তু বিশৃঙ্খলা ছিল এর সবচেয়ে বড় একটি বিপত্তি। সে ব্যক্তি সম্পদশালী ছিল কিন্তু তার মাঝে নিগরানী বা দেখাশুনার মনমানসিকতা ছিল না বা সেদিকে দৃষ্টি দিত না। কর্মচারীরা ছিল অসৎ ও দুর্নীতিবাজ। যারা বাজার করতো তারা দামী জিনিস নিয়ে আসতো আর পরিমাণে কম আনতো। আর ব্যবহারকারীরা কিছুটা নিজেদের ঘরে নিয়ে যেত। যারা খাবার রান্না করতো তারা কিছু নিজেরা খেয়ে ফেলতো, কিছুটা আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতোআর কিছুটা এদিক-সেদিক নষ্ট হতো। অনুরূপভাবে স্টোর রুম খোলা থাকতো আর সারা রাত কুকুর এবং খেকশিয়াল সেসব খাদ্যসামগ্রী খেতো এবং নষ্ট করতো। ফলাফল যা দাঁড়ায় তাহলো, সেই ব্যক্তি ঋণে জর্জরিত হয়ে পড়ে আর বিশ বছরের বিশৃঙ্খলার পর তাকে

জানানো হয় যে, তুমি ঋণগ্রস্ত হয়ে গেছ। সে যেহেতু প্রকৃতিগতভাবে উদার ছিল তাই সে লঙ্গরখানা বন্ধ করতে চায়নি। কিন্তু ঋণ পরিশোধের চিন্তাও তার ছিল। সে পরামর্শের জন্য তার বন্ধু-বান্ধবদের ডাকে। সে নিজের দোষ-ত্রুটির কথা তাদেরকে কিছুই বলেনি আর কেউ বলেও না। সে সবাইকে বলে, আমি ঋণী হয়ে পড়েছি।

তারা সবাই বলে, স্টোররুমের কোন দরজা নেই, সারারাত খেকশিয়াল এবং কুকুর খাদ্য-দ্রব্য এবং খাদ্রসামগ্রী ইত্যাদি নষ্ট করতে থাকে তাই অনেক জিনিস নষ্ট হয়। স্টোরে যদি দরজা লাগিয়ে দেয়া হয় তাহলে অনেকটা সাশ্রয় হওয়া সম্ভব। সে দরজা লাগানোর নির্দেশ দেয় আর দরজা লাগিয়ে দেয়া হয়। এটি একটি কাহিনী মাত্র আর কাহিনীতে কুকুর-শিয়ালও অন্যান্য প্রাণীরাও কথা বলে। বলা হয়, রাতের বেলা কুকুর এবং খেকশিয়ালরা স্টোররুমের দরজা বন্ধ দেখে এবং অনেক হৈ-চৈ বা হট্টগোল করে। হঠাৎ বয়স্ক এবং অভিজ্ঞ কোন কুকুর বা শিয়াল সেখানে আসে আর জিজ্ঞেস করে, তোমরা হৈ-চৈ কেন করছো? অন্যরা উত্তর দেয়, স্টোররুমে দরজা লাগানো হয়েছে, এখন আমরা খাব কোত্থেকে? আমাদের এলাকার সব কুকুর ও খেকশিয়াল এখান থেকেই খাবার খেতো। সে বলে, তোমরা অনর্থক কান্নাকাটি করছ, হৈ-চৈ করছো আর সময় নষ্ট করছো। যে ব্যক্তি বিশ বছর পর্যন্ত নিজের ঘর লুটপাট হতে দেখেছে এবং সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেয়নি তার স্টোরের দরজা কে বন্ধ করবে? সে নিজে তো আর এর তত্ত্বাবধান করবে না তাই চিন্তার কিছু নেই।

এই কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, 'যদি চায়' এবং সত্যিকার অর্থে 'চাওয়ার' মাঝে অনেক পার্থক্য আছে। কুকুর এবং খেকশিয়ালরা হৈ-চৈ করে যে, যদি 'সে চায়' আর দরজা বন্ধ করে দেয় তাহলে খাব কোত্থেকে? আর এদের মাঝে যে অভিজ্ঞ এবং বয়স্ক নেতা ছিল সে বলে, এই সম্পদশালী ব্যক্তি এদিকে মনোযোগই দিবে না, সে চাইবেই না, তাই হৈ-চৈ করার কী আছে? এটি বর্ণনা করার পর হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের জামাতের সদস্যরা যদি না চায় তাহলে কিছু হওয়া সম্ভব নয় কিন্তুতারা যদি চায় তাহলে অনেক কঠিন কাজও স্বল্পতম সময়ে সমাধা করতে পারে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের শৈশবের বিভিন্ন কাহিনীর মাঝে আলাদিনের প্রদীপের কাহিনীও অনেক প্রসিদ্ধ। আলাদিন এক দরিদ্র ব্যক্তি ছিল, তার একটি প্রদীপ হস্তগত হয়, সে যখনই সেই প্রদীপে ঘর্ষণ করত এক দৈত্য সামনে আসত, এটি শিশুদের একটি কাহিনী, সেই দৈত্যকে সে যা-ই বলত সে তাৎক্ষণিকভাবে তার সামনে তা হাজির করত, দৃষ্টান্ত স্বরূপ সে তাকে রাজপ্রাসাদ নির্মাণের নির্দেশ দিলে সে নিমিষেই রাজ প্রাসাদ এনে হাজির করতো।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমরা সেই সময় মনে করতাম, আলাদিনের প্রদীপের ঘটনা একটি সত্য ঘটনা কিন্তু বড় হলে আমরা বুঝতে পারি, এটি শুধু কাল্পনিক একটি গল্প বা কল্পকাহিনী। কিন্তু যৌবন পেরিয়ে যখন বৃদ্ধ বয়সে পদার্পণ করলাম তখন বুঝতে পারলাম, এই কথা সঠিক। এখানে বসে অনেকেই হয়তো চিন্তা করবে, মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)কীভাবে বলছেন যে, এটি সঠিক।আলাদিনের প্রদীপ অবশ্যই রয়েছে কিন্তু সেই প্রদীপ তেলের প্রদীপ নয় বরং তা দৃঢ় সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ হয়ে থাকে।

খোদা তা'লা যাকে সেই প্রদীপ দান করেন সে সেই প্রদীপকে কাজে লাগায় আর যেহেতু সংকল্প এবং প্রত্যয় খোদা তা'লার গুণাবলীর অন্তর্গত বিষয়, যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা 'কুন' বললে কাজ হওয়া আরম্ভ হয়ে যায় অনুরূপভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশের অধীনে তাঁর নির্ধারিত নীতির অধীনে তাঁর নির্দেশাবলী মান্য করে, (এগুলো হলো শর্ত) তাঁর কাছে দোয়া করে, তাঁর সাহায্য যাচনার মাধ্যমে কোন মানুষ যদি 'কুন' বা হও বলে তাহলে তা হয়ে যায়। এক কথায় শৈশবে আলাদিনের প্রদীপে আমরা বিশ্বাসী ছিলাম কিন্তু যৌবনে আমাদের সেই ধারণা কিছুটা দোদুল্যমান হয় কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা লাভের পর বুঝতে পেরেছি, আলাদীনের প্রদীপের কাহিনী সত্য কিন্তু এটি একটি রূপক ঘটনা আর সেই প্রদীপ পেতলের নয় বরং তা সংকল্প এবং প্রত্যয়ের প্রদীপ, এতে যখন ঘর্ষণ করা হয় তখন কাজ যত বড়ই হোক না কেন স্বল্পতম সময়ে সেই কাজ সাধিত হয়।

অতএব আমাদের প্রত্যেকের চিন্তাধারা এমনই হওয়া উচিত যে, আমরা শুধুমাত্র 'যদি চাই' পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকব না বরং আমাদেরকে সত্যিকার অর্থে চাইতে হবে আর এর সাথেই নিজেদের সকল শক্তি সামর্থ উজাড় করে কাজ করতে হবে এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাইতে হবে। কেউ কেউ এমনও আছে যারা চায়, অনেক সময় ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও, চাওয়া সত্ত্বেও কাজ হয় না। তাদের সেই ইচ্ছা এবং চাওয়াতে পূর্ণ আন্তরিকতা থাকে না। এই চাওয়ার সাথে চাওয়ার যেসব অনুসঙ্গের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা থাকে না অর্থাৎ সংকল্প, প্রত্যয় থাকে না, পরিশ্রম করা হয় না, শুধু মনে মনে চায় আর চাওয়াই সার।

উদাহরণ স্বরূপ আমি নামাযের বিষয়টা নেই, নামাযের প্রশ্ন যখন আসে, অনেকেই আমার কাছে এসে বলে, দোয়া করুন, আমরা নিয়মিত নামায পড়তে চাই কিন্তু আমরা রীতিমত নামায পড়তে পারি না। অন্য কাজ যখন চায় করে ফেলে কিন্তু নামায পড়তে চাইলেও যেহেতু অনিহার সাথে চায়, এর জন্য সকল শক্তি সামর্থ নিয়োজিত করে না এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে সাহায্য চায় না তাই নামাযের অভ্যাসও হয় না। এমন লোকদের চাওয়া আসলে না চাওয়ারই নামান্তর। হতেই পারে না যে, মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে আর সে কাজ হবে না। নামায সত্যিকার অর্থে তাদের জন্য একটি গৌণ বিষয়, তাদের মুখ্য উদ্দেশ্য হয়ে থাকে জাগতিক কাজ, সে কারণে নামাযের ওপর তারা প্রতিষ্ঠিত হয় না। এটি কীভাবে সম্ভব যে, মানুষ কোন কাজ করতে চাইবে আর কাজ করার দৃঢ় সংকল্পও করবে অথচ সে কাজ হবে না? তাই আসলে মানুষের নিজেরই আলস্য ও অনিহাকেই অনর্থক চাওয়া আখ্যা দেয়া হয়ে থাকে।

তিনি (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, আমরা শৈশবে একটি গল্পশুনতাম আর শুনে হাসতাম। অথচ হাসির জন্য নয় বরং ক্রন্দনের জন্য সেই কাহিনী বর্ণনা করা হয়েছে। আর এতে বর্তমান যুগের মুসলমানদের চিত্র অংকন করা হয়েছে, কিন্তু এই কাহিনী যিনি শুনিয়েছেন তিনি ইঙ্গিতে মুসলমানদের অবস্থা তুলে ধরেছেন যেন

মৌলভী তার পিছু ধাওয়া না করে। কোন আহমদী যদি এমন কাজ করে তাহলে তাকেও আত্মবিশ্লেষণ করতে হবে। সেই কাহিনীটি হলো কারো এক দাসী বা চাকরানী ছিল যে সেহরীর সময় রীতিমত উঠতো কিন্তু সে রোযা রাখতো। ঘরের গৃহকর্তী ভাবলেন, সে হয়ত কাজে সাহায্যের জন্য ওঠে। কিন্তু সে যেহেতু রোযা রাখতো না তাই ঘরের মালিক চিন্তা করেন, একে অনর্থক সেহরীর সময় কষ্ট দেয়ার প্রয়োজন কী? সেই সময়ের কাজ আমি নিজেই করব। দু'চার দিন পর সেই ঘরের মালিক বলেন, তুমি সেহরীর সময় উঠো না, আমি নিজেই এ সময়ের কাজ সেরে নিব, তোমার কষ্ট করার প্রয়োজন নেই। একথা শুনে সেই মেয়ে বিস্ময়ের সাথে গৃহকর্তীর দিকে তাকায় এবং চিন্তা করে, বলছে কী? সেই মেয়ে বলে, বেগম সাহেবা! আমি নামায পড়ি না, রোযাও রাখি না, যদি সেহরীও না খাই তাহলে কী কাফির হয়ে যাব না? সত্যিকার অর্থে এটি প্রতীকি ভাষায় সেসব লোকের অবস্থার চিত্র অংকন করা হচ্ছে যারা নামায পড়ে না।

তিনি বলেন, (জুমুআতুল বিদার প্রেক্ষাপটে এটি বলা হচ্ছে, কিন্তু প্রত্যেক জুমুআ এবং প্রত্যেক নামাযের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য) তুমি অন্য ভাষায় এটি বলতে পার, যদি কোন মুসলমানকে বলা হয়, মিঞাঁ জুমুআতুল বিদা পড়ে লাভ কি, কেন নিজেকে কষ্ট দাও এ বাহানায়?বছরের অন্যান্য জুমুআ যেহেতু পড়নি তাই এই জুমুআও পড়ার দরকার কী? তখন সে বিস্ময়ের সাথে তোমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে আর বলবে, ভাইজান, আপনি বলছেন কী? আমি প্রাত্যহিক নামাযের জন্য মসজিদে যাই না, রোযাও আমি রাখি না, জুমুআতুল বিদাও যদি না পড়ি, তাহলে কী কাফির হয়ে যেতে বলছেন? অতএব একবেলা মসজিদে এসে নামায পড়া আর মনে করা যে, আবশ্যকীয় দায়িত্ব পালন করে নিলাম, এটি একটি হাস্যষ্কর বিষয়।

এটি তাদের জন্য, যারা মনে করে মসজিদে গিয়ে এক বেলার নামায পড়লেই তার ফরয দায়িত্ব পালন হয়ে গেল আর এটিই যথেষ্ট। অতএব যারা রীতিমত নামাযের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করে না তারা এমন লোকদেরই অন্তর্ভুক্ত। পাঁচবেলার নামায প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক মুসলমানের জন্য আবশ্যক। পুরুষদের জন্য মসজিদে গিয়ে বা জামাতের সাথে নামায পড়া আবশ্যক, এর ব্যবস্থা হওয়া উচিত। যদি এটি বল, আমরা সাবালক নই বা আমাদের কোন বিবেক-বুদ্ধি নেই, তাহলে ঠিক আছে, কিন্তু এই উভয় কারণের কোনটি যদি না থাকে তাহলে সব জায়গায় বা সর্বত্র জামাতের সাথে নামায পড়ার চেষ্টা থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিজেই শুনেছি আর হুযূরের রচনাবলীতেও এই কাহিনী দেখা যায়। কোন বাদশাহ্ বা সম্পদশালী ব্যক্তি যখন কোন স্থানে যায় তার আর্দালী বা পিয়নও সাথে যায়। সে যেহেতু তখন সাথেই থাকে তাই তার ভেতরে যাওয়ার জন্য পৃথক অনুমতির প্রয়োজন হয় না। আজকালও দেখুন! যখন মন্ত্রী বা অন্য কোন উচ্চউচ্চপদস্থ কর্মকর্তা আসে তখন প্রটোকল কর্মকর্তা বা তার অধীনস্ত কর্মকর্তা বা নিরাপত্তা রক্ষীরা সবাই তার সাথে যায় এজন্য পৃথক কোন অনুমতির প্রয়োজন হয় না।সেযুগে ভারতে বা পাকিস্তানে ইংরেজদের রাজত্ব ছিল এবং সেসব অঞ্চলে ভাইসরয়নিযুক্ত করা হতো। ভাইসরয় যদি কোন গভর্ণরকে তলব করেন তখন আর্দালি কোন নিমন্ত্রণ না থাকলেওসে গভর্ণরের সাথেই যাবে আর তার নিরাপত্তা রক্ষী এবং সেবকরাও সেই দাওয়াতে যোগ দিবে বা অন্তর্ভুক্ত হবে। তিনি (রা.) বলেন, অনুরূপভাবে তোমাদের অবস্থা যত নিম্নমানেরই হোক না কেন যদি ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন কর তাহলে তারা যেখানেই যাবে তোমরা তাদের সাথে যাবে। আল্লাহ্ তা'লার সাথে যদি নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয় তাহলে তাঁর ফিরিশ্‌তাদের সাথেও সম্পর্ক গড়ে উঠবে আর তোমরা তাঁর আর্দালি বা সহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে। তারা যদি মানুষের হৃদয় ও মনমস্তিষ্কে প্রবেশ করে তোমরাও তাদের সাথে যাবে।

তিনি (রা.) বলেন, এই অসাধারণ শক্তিকে বোঝার চেষ্টা কর যা খোদা তা'লা তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তোমাদের শক্তি আধ্যাত্মিকতার সাথে সম্পর্ক রাখে, তোমরা একে দৃঢ় করার জন্য ফিরিশ্‌তাদের সাথে যত বেশি সম্পর্ক গড়ে তোলা যায় গড়ে তোলো যেন মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার শক্তি অর্জন করতে পার। যদি মানুষের হৃদয়ে পৌঁছার শক্তি অর্জন হয় তাহলে সকল পর্দা ছিন্ন হবে আর খোদার নূর বা জ্যোতি যেখানে পৌঁছবে তোমরাও সেখানে প্রবেশ করতে পারবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) জলসায় আগমনকারীদেরকে তখন নসীহত করেন, তোমরা নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হও।যে আগ্রহ নিয়ে এখানে এসেছ তা বাস্তবায়নের সম্ভাব্য সকল চেষ্টা কর। এমনটি যেন না হয় যে, নৌকা দেখার জন্য কিছু মানুষ যেভাবে প্রথমে এসে যায় তোমাদের আগমন যেন তদ্রুপ না হয়, বরং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ে তোলো। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক গড়ার ফলে আল্লাহ্‌র ফিরিশ্‌তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হবে। আর এই আধ্যাত্মিকতা তখন মানুষের মনমস্তিষ্কে যেই প্রভাব ফেলবে এর ফলশ্রুতিতে তোমাদের কাজ ফিরিশ্‌তারাই করবে। যেখানেই তারা পৌঁছবে সেখানে তোমাদের নামও পৌঁছাবে। কেননা তোমাদের উদ্দেশ্য নেক, আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে তোমরা উন্নত আর তোমাদের কাজ হচ্ছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি।

অতএব এই মৌলিক নীতিকে আমাদের সব সময় স্মরণ রাখা উচিত, আমরা যখন কোন জায়গায় সমবেত হই, তা জলসা হোক বা ইজতেমা, আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য যখন আমরা সমবেত হই সেখানে আমাদের সেই লক্ষ্য অর্জনের সকল চেষ্টা করা উচিত। আপনাদের বৈঠক বা মজলিসযেন সাময়িক আধ্যাত্মিক বৈঠক না হয় বরং তাতে যেন স্থায়ী আধ্যাত্মিক বৈঠকের পরিবেশ এবং প্রভাব থাকে, আর ফিরিশ্‌তারাও যেন আমাদের সাহায্যকারী হয়ে যায়। যেখানে আমরা চেষ্টা করব সেখানে ফিরিশ্‌তারা এসে যেন প্রভাব বিস্তার করে এবং আমাদের চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে ফলপ্রসূ করে। সব সময় স্মরণ রাখতে হবে, সত্যিকার মু'মিন সে, যে সৎকাজ করে। সৎকাজ করলে পূর্বের চেয়ে অধিক বিনয় এবং ইস্তেগফারের মাধ্যমে খোদার কাছে অধিক নেক কর্মেও সামর্থ লাভের জন্য দোয়া করা উচিত এবং একজন মু'মিন তাই করে থাকে, যেন এই ধারা অব্যাহত থাকে আর তার পরিণাম শুভ হয়।

হযরতমুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কোন

কোন সাহাবী বলেন, আমরা যখন মহানবী (সা.)-কে দোয়া করতে দেখতাম তখন আমাদের এমন মনে হতো যেন একটি পাতিলে পানি টগবগ করে ফুটছে। অতএব নিজ প্রবৃত্তির সংশোধনের প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ কর, পবিত্র হও। একথা মনে করো না বা ভেবো না যে, তোমরা নেক কাজ করছ, সবচেয়ে বড় নেক কর্মের ফলেও ঈমানহীনতা সৃষ্টি হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, জানি না কেন আজকাল মানুষ হজ্জ করে আসে কিন্তু তাদের হৃদয়ে পূর্বের চেয়ে বেশি অহংকার, আত্মশ্লাঘা এবং পাপ দানা বাধে;এর কারণ হলো, হজ্জের প্রকৃত মর্ম এবং অর্থ এরা বোঝে না। আধ্যাত্মিকভাবে বিন্দুমাত্র লাভবান হওয়ার পরিবর্তে নিরেট হাজী সেজে অহংকার প্রদর্শন আরম্ভ করে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি কাহিনী শোনাতেন যে, এক বৃদ্ধা শীতকালে রাতের বেলায় ষ্টেশনে বসে ছিলেন, কেউ তার চাদর নিয়ে যায়, তার যখন শীত লাগে সে চাদর গায়ে দিতে গিয়ে এটি দেখে চিৎকার করে বলে, ভাই হাজী আমার শুধু একটিই চাদর ছিল আমার প্রয়োজন আছে, সেটি ফেরত দাও। হাজ্জী পাশেই বসে ছিল, নিয়ে চলে যায় নি, নিয়ে যাওয়ার ছিল, একথা শুনে সে লজ্জিত হয় আর চাদর তাকে ফেরত দেয় এবং একই সাথে জিজ্ঞেস করে, যে চাদর চুরি করেছে সে যে একজন হাজী একথা তুমি কীভাবে জানলে? সেই মহিলা বলেন, এযুগে এমন পাষণ্ডতা হাজীরাই প্রদর্শন করতে পারে।

অতএব একথা ভেবো না যে, আমরা নেক কর্মেনিয়োজিত। একথা ভেবো না যে, আমরা পূতঃ-পবিত্র সংকল্প রাখি, মানুষ যত নেক কাজই করুক না কেন তা থেকেও পাপের সূচনা হতে পারে। মানুষের সংকল্প যতই নেক হোক না কেন তা তার ঈমানকে বিকৃত করতে পারে। ঈমান আমাদের কর্মের ফলে লাভ হয় না বরং খোদা তা'লার করুণার ফলে লাভ হয়। এটি একটি মৌলিক কথা যা আমাদের স্মরণ রাখা উচিত। আমাদের কর্ম যতই হোক না কেন খোদার দয়া যদি না হয়, তাঁর কৃপা যদি না থাকে, ঈমান কোনভাবেই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

তাই সব সময় খোদার দয়া-মায়ার ওপর দৃষ্টি রাখো আর তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় তাঁর পবিত্র হাতের দিকে যায়। কেননা যে ভিখারী এই বিশ্বাস রাখে যে, খোদার দ্বার পরিত্যাগের পর আমার জন্য অন্য কোন দ্বার খুলতে পারে না এমন ব্যক্তি খোদা তা'লার কৃপারাজিকে আকর্ষণ করে। অতএব তোমাদের দৃষ্টি যেন সব সময় খোদার প্রতিই নিবদ্ধ থাকে। তোমরা যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর সত্তায় দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে ততক্ষণ নিরাপদ থাকবে, কেননা যার চোখ খোদার সত্তার প্রতি নিবদ্ধ,যে খোদার পথপানে চেয়ে থাকে কেউ তার ক্ষতি করতে পারে না। যখনই দৃষ্টি অন্য দিকে ফেরানো হয় আর খোদার দরজা থেকে সে যদি চলে যায়, তার সংকল্প যতই নেক হোক না কেন, সে যত ভালো কাজই করুক না কেন তার কোন ঠাঁই নেই বরং শয়তানের ক্রোড়ে গিয়ে সে আশ্রয় নেয়। তাই স্থায়ীভাবে তওবা, ইস্তেগফার, তাঁর কৃপারাজীর ভিক্ষা চাওয়া, তাঁর ফযল আকর্ষণ করা এসব বিষয়ই শুভ পরিণাম এবং পরিনতির দিকে মানুষকে নিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একটি ঘটনা শোনাতেন। তিনি বলতেন, হযরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে বা হযরত ওমর (রা.)-এর ঘরে, আমার সঠিক মনে নেই, চুরির ঘটনা ঘটে, কোন গহনা চুরি হয়। তার এক চাকর ছিল, যে হৈ-চৈ করে উঠে যে, এমন দুর্ভাগাও কি পৃথিবীতে আছে যে আল্লাহ্‌র খলীফার ঘরে চুরি করতেও দ্বিধা করে না। যে চুরি করেছে, তাকে সে সীমাহীন অভিশাপ দিচ্ছিল আর বলছিল যে, আল্লাহ্ তার চুরি প্রকাশ করুন, তাকে লাঞ্ছিত করুন। অবশেষে তদন্ত করতে গিয়ে জানা যায়, সেই গহনা এক ইহুদীর ঘরে বন্ধক রাখা হয়েছে। সেই ইহুদীকে যখন জিজ্ঞেস করা হয়, এই গহনা কোথায় পেয়েছ? সে সেই চাকরের কথাই বলে যে হৈ-চৈ করছিল আর চোরকে অভিশাপ দিচ্ছিল।

অতএব মৌখিকভাবে আনুগত্য করা বা অভিশাপ দেয়া কোন অর্থ রাখে না, আসল জিনিস হলো কর্ম। মৌখিকভাবে যে আনুগত্যের দাবি করে সে অনেক সময় সবচে বড় মুনাফিক বা কপটও হতে পারে। তাই এটি সত্যিই চিন্তার বিষয় আর এদিকে বা এই কথার প্রতি সবসময় আমাদের মনোযোগ নিবদ্ধ থাকা চাই।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এক জায়গায় আহমদীয়াতের এক শত্রুর কথা উল্লেখ করেন যে কিনা বড় বড় বুলি আওড়িয়েছিল যে, আমরা আহমদীয়াতকে পিষ্ট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তিনি (রা.) বলেন, আমিও তাকে এই উত্তর দিতে পারতাম যে, তুমি পিষ্ট করে দেখাও। কিন্তু তা না করে আমি তাকে বলেছি, কাউকে নিশ্চিহ্ন করা বা না করা বা কাউকে প্রতিষ্ঠিত রাখা বা স্থায়ীত্ব দেয়া এটি খোদা তা'লার নিয়ন্ত্রণে। যদি আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করতে চান তাহলে আপনাদের চেষ্টার কোন প্রয়োজন নেই, তিনি নিজেই নিশ্চিহ্ন করবেন। কিন্তু তিনি যদি আমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তাক্বওয়াই মানুষকে এমন দাবি করা থেকে বিরত রাখে যে, আমি হেন করব, তেন করব, তাক্বওয়াই একথা বুঝায়।

তাই হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমি এই উত্তর দিয়েছি যে, আমাদের কিছু করার কোন শক্তি নেই কিন্তু আল্লাহ্ যদি আমাদেরকে স্থায়ীত্ব দিতে চান, প্রতিষ্ঠিত রাখতে চান তাহলে কেউ আমাদের কিছুই করতে পারবে না। তাক্বওয়াই মানুষকে এমন দাবি থেকে বিরত রাখে যে, হেন করব, তেন করব। এমন দাবি করে লাভ কী? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, কাদিয়ানে বা অন্য কোন স্থানে ভয়াবহ কলেরার প্রকোপদেখা দেয়, এক জানাযার সময় একজন বলতে আরম্ভ করে, এরা নিজেরাই মরে। কলেরার প্রাদুর্ভাব হয়েছে, মানুষ তবু খাওয়া এবং পান করা থেকে বিরত হয়না আর পেট ভরে খায়, একথাও চিন্তা করে না যে, এটি এখন কলেরার সময়। যে একথা বলছিল, সে বলে, আমরা শুধু একটি ছোট চাপাতি বা রুটি খাই কিন্তু এই হতভাগারা পেটপুরে খায় এবং এরফলে কলেরায় মারা যায়।

দ্বিতীয় দিন আরো একটি জানাযা আসে। কেউ জিজ্ঞেস করে, এই জানাযা কার? সেখানে মানুষ তার কথা শুনতে শুনতে বিরক্ত ছিল, তখন 'এই জানাযা কার?' এই প্রশ্ন শুনে উত্তরে একজন বলে, এই জানাযা সেই ব্যক্তির যে শুধু একটি চাপাতি খায়।

অতএব এমন দাবি করে লাভ কী যে, আমরা হেন করব বা তেন কবর। হ্যাঁ, আল্লাহ্ তা'লা যা বলেন, তা আমরা বলতে পারি, এমনটি হয়ে যাবে। বিনয়ের অর্থ এই নয় যে, খোদা যা বলেন তা গোপন করব, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, 'কাতাবাল্লাহু লা আগলিবান্না আনা ওয়া রুসূলী' (সূরা মুজাদেলা: ২২) অর্থাৎ আমরা এটি অবধারিত করে রেখেছি যে, আমরা এবং আমাদের রসূল অবশ্যই জয়যুক্ত হব। যদি কেউ আমাদেরকে বলে, আমরা তোমাদেরকে পিষ্ট করব তাহলে আমি বলতে পারি, আমার শক্তির যতটুকু সম্পর্ক আছে তাতে আমি কিছু বলতে পারি না কিন্তু এই শব্দ যদি আহমদীয়াত সম্পর্কে বলা হয় তাহলে এটি কখনও হতেই পারে না। আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে, ইনশাআল্লাহ্।

আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতিতে আমাদের সে পরিমান বিশ্বাস রয়েছে যতটা আমাদের নিজেদের প্রাণের ওপরও নেই। অতএব আহমদীয়াত অবশ্যই জয়যুক্ত হবে। আমাদের জীবদ্দশায় আসুক বা পরে কিন্তু এই বিজয় যাত্রায়শরীক হওয়ার জন্য আমাদেরকে তাক্বওয়ার ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হবে যেন বংশপরম্পরায় এটি প্রতিষ্ঠিত থাকে। আমাদের যুগে যদি বিজয় না আসে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সেই বিজয় দেখে।

দোয়া কীভাবে করা উচিত আর আহমদীরা যে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন তা থেকে উত্তোরণ কীভাবে সম্ভব; এর ওপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, পৃথিবীতে ভালোবাসার সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ সেটিই হয়ে থাকে যা মা তার পুত্রের সাথে বা সন্তানের প্রতি প্রদর্শন করেন। প্রায় সময় মায়ের বক্ষের দুধ শুকিয়ে যায় কিন্তু বাচ্চা বা শিশু যখন ক্রন্দন করে তখন আবার দুধ নেমে আসে। অতএব যেভাবে শিশুর ক্রন্দন ছাড়া মাতৃবক্ষে দুধ আসতে পারে না অনুরূপভাবে খোদা তা'লাও তাঁর রহমতকে বান্দার ক্রন্দন এবং আহাজারির সাথে সম্পর্কযুক্ত করেছেন। বান্দা যখন আহাজারি করেরহমতের দুধ নাযিল হয় বা নেমে আসে। তাই আমি যেমনটি বলেছি, আমাদেরকে নিজেদের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক চেষ্টা করা উচিত কিন্তু সেই চেষ্টা নয় যা মোনাফিকরা করে থাকে। যত বেশি দোয়া করা যায় আমাদের করা উচিত। দোয়াকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানো উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) তখন তাহরীক করেছিলেন যে, ৭টি রোযা রাখুন আর দোয়া করুন। কয়েক বছর পূর্বে আমিও জামাতকে রোযা রাখার কথা বলেছিলাম, নফল রোযা রাখা উচিত। জামাতে আজও কেউ কেউ এমন আছে যারা এর ওপর প্রতিষ্ঠিত, তারা রোযা রাখে। আমাদের এখন অন্ততঃপক্ষে সপ্তাহে একটি করে হলেও বিশেষভাবে ৪০ সপ্তাহ পর্যন্ত ৪০টি রোযা রাখা উচিত। আর দোয়া করুন, নফল পড়ুন এবং সদকা দিন, কেননা জামাত এখন যেই পরিস্থিতির সম্মুখীন, কোন কোন জায়গায় পরিস্থিতি কঠিনতর হচ্ছে। আমরা যদি আল্লাহ্‌র দরবারে আহাজারী করি তাহলে যেভাবে শিশুর ক্রন্দনে মায়ের বক্ষে দুধ নেমে আসে তেমনিভাবে আমাদের স্বর্গীয় প্রভুর সাহায্যও আকাশ থেকে নাযিল হবে আর সেসব প্রতিবন্ধকতা এবং সমস্যা যা আমাদের পথে বিরাজমান তা দূর হবে। পূর্বেও দুরীভূত হয়েছে আর এখনও তা দুরীভূত হবে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কিছু সমস্যা এমন হয়ে থাকে যা দূর করা আমাদের শক্তির উর্ধ্বে। শত্রুর মুখ আমরা বন্ধ করতে পারি না। তাদের কলমকে আমরা বাধাগ্রস্ত করতে পারি না। তাদের মুখ এবং কলম থেকে এমন কিছু বের হয় যা শোনা এবং পড়ার শক্তিও আমাদের নেই আর আজকাল আমরাদের চোখে পড়ে, পাকিস্তানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপন ছাপা হয় বা লাগানো হয় যার ভাষা চরম নোংরা। তখনও সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হতো অথচ তখন ইংরেজদের রাজত্ব ছিল কিন্তু তখনও কথায় কর্ণপাত করা হতো না। তারা সেভাবেই শুনতো যেভাবে এক বধির শুনে।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সেসব কথা যা মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে এখন বলা হয় তা অন্য কারো সম্পর্কে বলা হলে দেশে আগুন লেগে যাওয়ার কথা। কিন্তু সেসব কথা অবিরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে বলা হয় কিন্তু যারা এমন কথা বলে তাদেরকে এতটুকুও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় না। অথচ আমরা এই রিপোর্টও পেয়েছি, সেই যুগের কথা, কোন কোন বিরোধী পরিমন্ডলে একথাও বলা হয়, সরকারী কর্মকর্তারা আমাদেরকে নিশ্চয়তা দিয়েছে, আহমদীয়াতের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছে তাই লেখ, তোমাদের কিছুই বলা হবে না।

জামাতের সাথে সব সময় এমন ব্যবহার হয়ে আসছে, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় প্রতিটি প্রতিবন্ধকতার মুখে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে জামাত উন্নতি করে চলেছে। এটি সেই সরকারের অবস্থা ছিল যেই সরকার জামাতের বিরুদ্ধে কোন আইন পাশ করেনি। পাকিস্তানে আহমদীদের বিরুদ্ধে আইনও রয়েছে আর সেই আইন বিরোধীদের সাহায্যও করে থাকে আর তারা যা ইচ্ছে তাই করে। মুখে যা আসে, যেই অপলাপ করতে হয়, বাজে কথা বলতে হয়, মসীহ্ মাওউদ (আ.) সম্পর্কে তারা বলে।

আহমদীদেরকে যুলুম এবং নির্যাতনের লক্ষ্যে পরিণত করা হয় আর আদালতও এখন শাস্তি দিতে বদ্ধ পরিকর। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয়ে তারা শাস্তি দিয়ে থাকে। এর জন্য খোদার দরবারে অনেক বেশি আহাজারী এবং ক্রন্দনের প্রয়োজন রয়েছে, বিশেষ করে পাকিস্তানের আহমদীদের এ দিকে পূর্বের চেয়ে অধিক মনোযোগ নিবদ্ধ করা প্রয়োজন। বিশুদ্ধ চিত্তে আর একনিষ্ঠভাবে খোদা তা'লার দরবারে ঝুঁকুন, নফল পড়ুন, সদকা দিন, রোযা রাখুন। দোয়া ছাড়া এবং খোদার রহমতকে আহ্বান করা ছাড়া আমাদের আর কোন উপায় নেই।

আল্লাহ্ তা'লা সেসব আহমদীকে, যেখানে যুলুম এবং অত্যাচার হচ্ছে বা যেসব দেশে হচ্ছে বা যেসব স্থানেই এই যুলুম এবং অত্যাচার আর নির্যাতন চলছে, এমন দোয়া করার তৌফিক দিন যা খোদার আর্‌শকে প্রকম্পিত করবে আর মোটের ওপর সারা পৃথিবীর আহমদীদেরকে জামাতের উন্নতি এবং যুলুম আর নির্যাতন থেকে নিরাপদ থাকার জন্য দোয়ার প্রতি মনোযোগ দেয়া উচিত। আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে এরতৌফিক দান করুন। (আমীন)

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনূদিত।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহদী

ইযালা-এ-আওহাম
(সন্দেহ-সংশয় নিরসন)

প্রনয়ন ও প্রকাশনা ১৮৯১

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

(১৭তম কিস্তি)

(ফার্সী ভাষায় রচিত কবিতার অনুবাদ ঃ)

১। মসীহ্ ও তাঁর অবতরণের উল্লেখ যেখানে রয়েছে, সেখানে মানুষ বিশ্বাস করুক বা না করুক আমি এটাই বলবো যে,

২। সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্ আমাকে ইল্‌হাম-যোগে জ্ঞাত করেছেন যে, আমি সেই মনোনীত বান্দা (মসীহ্)-এর সত্যিকার অর্থে বিকাশস্থল।

৩। আমি প্রতিশ্রুত পুরুষ এবং পবিত্র হাদীস মোতাবেক চিহ্নিত আমার অবয়ব ও দৈহিক গঠন রয়েছে। চোখ মেলে তারা যদি আমায় না দেখে তা হলে তাদের প্রতি আক্ষেপ।

৪। আমার রয়েছে গধুম বর্ণ এবং চুল সম্পর্কিত পার্থক্যও দৃশ্যমান– যেভাবে আমার মনিব (সা.)-এর পবিত্র হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

৫। আমার আগমন সংশ্লিষ্ট সত্যতায় কোনো সংশয়ের অবকাশ নেই–আমার মনিব (সা.) আমাকে রক্তিম বর্ণের মসীহ্ থেকে পৃথক রঙে চিহ্নিত করেছেন।

৬। পূর্বীয় মিনারা সম্পর্কিত কথায় বিস্মিত হয়ো না, যখন কি-না আমার সূর্যোদয় পূর্বদিকেই হয়েছে।

৭। সার্বিক সুসংবাদসমূহ অনুযায়ী আমি এসেছি। কোথায় সে ঈসা (আ.) যিনি আমার মিম্বারে দাঁড়াবেন?

৮। খোদা তা'লা যাকে চির-আবাসস্থল জান্নাতে স্থান দিয়েছেন তাকে তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে 'ফিরদৌস' থেকে কেনই-বা বের করবেন?!

৯। যেহেতু 'কাফির' (খ্রিষ্টানগণ) অকারণে মসীহ্‌র অযথা উপাসনা করে থাকে, কাজেই খোদা তা'লার আত্মাভিমান আমাকে মসীহ্‌র সমকক্ষ বানিয়েছে।

১০। যাও এবং কুরআন করীমে গভীর মনোনিবেশে দৃষ্টি দাও, যাতে আমার জন্য আমার সম্পর্কিত গোপন রহস্য ["আ-আন্তাকুল্‌তা লিন্নাস" (সূরা মায়েদা ঃ শেষ রুকু)] উন্মোচিত হয়।

১১। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! কাশ্‌ফ বিষয়ক গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ লোক কোথায়? যাতে তারা তাঁদের অভ্যন্তরীণ জ্যোতি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের কাছে জেনে প্রকৃত সংবাদ এনে দিত।

১২। এই 'কিবলা' (মহানবী সা.) হিজরী চৌদ্দ শতাব্দীতে তাঁর চেহারা প্রদর্শন করলেন 'হারেম' (তথা কা'বা শরীফের চার দেয়াল ঘেরা চত্তর) থেকে প্রতিমা বহিষ্কারের তেরো শ' বছর পর।

১৩। ঐশীকল্যাণরাশীর এই উৎসমূলের করুণাধারা এতো উদ্বেল হয়ে উঠলো যে আমার সব ওলি-গলি থেকে সেই প্রিয় বন্ধুর ডাক আসতে লাগলো।

১৪। হে আপত্তিকারী! খোদাকে ভয় কর এবং একটু ধৈর্য ধর, যাতে করে খোদা স্বয়ং আমার নক্ষত্রের জ্যোতি প্রকাশিত করেন।

১৫। তুমি কি পাঠ করনি ঃ 'যেন নেক নিয়্যত বা বিমল হৃদয়কে কাজে লাগাও'? অতএব হে ভাই! তুমি কেন তাঁর নির্ধারিত সীমাসমূহ লঙ্ঘণ করছো?

১৬। আমার ওপর কেন তুমি তীক্ষ্ণধার মুখের ছুড়ি চালাও? আমি তো নিজে নিজে আসিনি। বরং খোদা তা'লা আমাকে পাঠিয়েছেন।

১৭। আমি তো আদিষ্ট। এ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে আমার কী-বা এখতিয়ার রয়েছে? যাও, এ বিষয়টি আমার প্রেরণকারী খোদার কাছে জিজ্ঞেস কর।

১৮। হে সেই ব্যক্তি, যে আমার দিকে শত শত দা-কুড়াল নিয়ে ধাবিত! এ বাগানের তত্ত্বাবধায়ককে ভয় কর, আমি যে এক ফলন্ত শাখা।

১৯। স্বর্গীয় আদেশ ধরায় পৌঁছাই। আমি যদি সে আদেশ শোনে মানুষদের না শোনাই তাহলে এটি কোথায় নিয়ে যাব?!

২০। হে আমার জাতি! আমার বক্তব্যে রুষ্ট হয়ো না। শুরুতেই এরকম উত্তেজনা দেখিও না। বরং শেষ অবধি আমার অবস্থা লক্ষ্য কর।

২১। আমি নিজে এ কথা (বিষয়) তুলে ধরি নি। বরং 'লওহে-মাহ্‌ফুজ' তথা সংরক্ষিত ঐশীফলকেই এমনটি লেখা রয়েছে। তোমার সাধ্য থাকলে ঐশী লিখন মুছে দাও।

২২। আমি আমার জাতির কারণে বিস্ময় ও ভাবনার বিপাকে আটকা পড়েছি। হে আমার করুণাময় প্রভু-প্রতিপালক! দয়াপরবশ হও, আমি যে এই চিন্তায় অস্থির।

২৩। তাদের যে চোখও অবশিষ্ট নেই, কানও নেই এবং হৃদয়ের আলোও নেই। একটা জিহ্বা ছাড়া আর কিছুই নেই–এক ঢেলাও যার দাম নয়।

২৪। আমাকে গালমন্দ দেওয়াকে তারা ইবাদত বলে ভেবে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিতে আমি সব মিথ্যেবাদীদের চেয়ে নিকৃষ্ট!

২৫। তবু হে অন্তর! তুমি এ লোকগুলোর প্রতি খেয়াল রাখো, কেননা অন্ততঃপক্ষে এরা যে আমার পয়গম্বর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের প্রতি ভালোবাসা রাখার দাবী করে।

২৬। হে সেই ব্যক্তি, যে ফেরেশ্‌তার মাধ্যমে প্রদত্ত বার্তা তথা আল্লাহ্‌র আহ্বানের অস্বীকারকারী! ভুল আমার মাঝে নয়, বরং তোমার মাঝেই বিদ্যমান।

২৭। হে স্নেহবর! আমার প্রাণ তোমার ঈমানের জন্য দুশ্চিন্তায় ওষ্ঠাগত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, তোমার ধারণায় আমি একজন 'কাফির'।

২৮। যদি তোমার ইচ্ছা থাকে, আমার সত্যতার প্রকৃতস্বরূপ যেন তোমার ওপর প্রতিভাত হয়, তাহলে তুমি সে একই দয়াল (প্রভু) পরম সত্তার কাছে হৃদয়ের জ্যোতি প্রার্থনা কর।

২৯। কাউকে কাফির বানানোর দিকে আমার ধ্যান কখন ও কেন-ই বা হবে? আমি তো আমার প্রিয় আল্লাহ্‌র অপার ও অঢেল অনুগ্রহ ভরা সুরা পানে মাতোয়ারা হয়ে আছি।

৩০। শত্রুর আঘাত আমার ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে? আমি তো বন্ধুর সুখ-কল্পনায় উন্মত্ত হয়ে আছি।

৩১। আমি তো নিত্য সাথী খোদা তা'লার ওহীর সাহায্য-সহায়তায় সঞ্জীবিত। তাঁর ইলহাম (ঐশীবাণী) আমার জন্য জীবন প্রদায়ী নিশ্বাসের ন্যায়।

৩২। আমি তো আমার বন্ধুর গৃহ-আঙ্গিনায় আস্তানা গেড়ে বসেছি। কাজেই তুমি আমাকে এ অন্ধকার জগৎ সম্পর্কে আর কিছুই জিজ্ঞেস করো না।

৩৩। তাঁর প্রেম আমার হৃদয়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রবেশ করেছে। আর তাঁর প্রীতি ধর্মপথে আমার জন্য উজ্জ্বল সূর্যের রূপ ধারণ করেছে।

৩৪। আমার এবং তাঁর মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক ভালোবাসার রহস্য যদি প্রকাশ হয়ে পড়তো তাহলে এক বৃহদসংখ্যক জনগোষ্ঠী আমার দরোজার সামনে এসে কোরবান হয়ে যেত।

৩৫। দুনিয়াদার সংসারাশক্ত আমার গোপন রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। আমি আমার জ্যোতি বাদুড়দের দৃষ্টি থেকে লুকিয়ে রেখেছি।

৩৬। আমার পথ ছেড়ে তারা যে-পথই বেছে নিক (বা পছন্দ করুক) সেটি অন্তঃসারশূন্য। সে-ব্যক্তি হতভাগ্য, যে তুচ্ছকে সম্মান দেয়।

৩৭। আমি তো প্রতি মুহূর্ত বন্ধুর মিলন ও সাক্ষাতের সুরাপানে সদা মাতোয়ারা এবং সর্বক্ষণ আমার অস্বীকারকারীর বিপক্ষে আমার বন্ধুর সকাশে সাহচার্য লাভে ধন্য।

৩৮। জান্নাতের বায়ুমন্ডলী আমার উষ্ণ হৃদয় জুড়ে বয়ে চলে এবং আমার উননের ধোঁয়া শত ধরণের উত্তম সুবাস ছড়ায়।

৩৯। বন্ধুর নৈকট্যের দরুন আমার ব্যাপার এমন উঁচু মার্গে উন্নীত হয়েছে যে আমি অপরাপর সবার জ্ঞান-বুদ্ধির ধরা-ছোঁয়ার ঊর্ধে ওঠে গেছি।

৪০। বন্ধুর অনুগ্রহক্রমে আমার পা জান্নাতে প্রবেশ লাভ করেছে এবং এ বন্ধুর স্নেহ-পরশেই আমার হাতে রয়েছে (তার সাক্ষাৎ লাভের) মিলন-পেয়ালা।

৪১। তাঁর সান্নিধ্যে আমার কবুলিয়তের উত্তাপ-উত্তেজনা আমার প্রার্থনার সময়ে যে-পরিমাণ প্রকাশ পায় সে পরিমাণ (আমার) কান্না-কাটি আমার মাও শোনেন নি।

৪২। আমি চতুর্দিক কেবল এই বন্ধুর চেহারা অবলোকন করি। এরপর আর কে আছে যে আমার খেয়াল ও কল্পনায় আসতে পারে?

৪৩। হায় আক্ষেপ! প্রিয়জনেরা আমাকে চিনলো না। এরা আমাকে তখন জানতে পারবে যখন আমি এ ধরা থেকে গত হয়ে যাব।

৪৪। তাদের দুঃখ-বেদনায় আমার হৃদয় যদি রক্তাক্ত হয়ে থাকে তাতে কিছু যায় আসে না। আমার তো আকাঙ্ক্ষা এই যে, এ ধ্যান ও অধ্যাবসায়ে যেন আমার মস্তকও কোরবান হয়ে যায়।

৪৫। প্রত্যেক রাত জাতির দরদ আমাকে সহস্র-সহস্র দুঃখ-বেদনায় আচ্ছন্ন করে ফেলে। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমাকে তুমি এই শোরগোল ও দৃষ্কৃতি প্রবণ যুগের কবল থেকে মুক্তি দাও।

৪৬। হে প্রভু-প্রতিপালক! আমার চোখের পানি দিয়ে তাদের এই আলস্য-অবজ্ঞা ধুয়ে দাও। দুঃখ-বেদনা ও যাতনায় আজ আমার বিছানা পর্যন্ত অশ্রুজলে সিক্ত হয়েছে।

৪৭। আমার দুঃখ মোচনের জন্য (হে প্রভু) শীঘ্র এসো। কেননা আমি তোমার সমীপে অশ্রুপাত করেছি। তুমি আমার ফরিয়াদ শোন। কেননা তুমি ছাড়া আমার আর কেউ-ই তো অবশিষ্ট রইল না।

৪৮। দুঃখ-দুশ্চিন্তার আঁধার যে শেষই হতে চায় না! এ অন্ধকার রাত হয়তো হাশর পর্যন্ত বিলম্বিত হবে।

৪৯। অ-গুণগ্রাহী এই অনাদরকারী জাতির দুঃখে আমার হৃদয় রক্তাক্ত হয়েছে, সেই সাথে বিপথগামী আলেমদের কারণেও– যারা আমার পেছনে লেগেছে।

৫০। যদি শুষ্কজ্ঞান ও হৃদয়ের দৃষ্টিহীনতা বাধা না হতো তাহলে সকল আলেম ও ফকীহ-ই আমার সম্মুখে সেবকদের মতো হয়ে যেতো।

৫১। আমার এসব কথায় পাথর পর্যন্তও প্রভাবিত হয়ে থাকে। কিন্তু এ লোকগুলো আমার সারগর্ভ প্রভাবশালী বাণীসমূহের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত।

৫২। ইল্‌ম বা জ্ঞান বস্তুতঃপক্ষে সেটিই,–সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির জ্যোতি যার নিত্য সহচর হয়ে থাকে। (তাদের) তমাশাচ্ছন্ন ইল্‌মকে তো আমি এক কড়ি মূল্য দিই না।

৫৩। আজকে আমার জাতি আমার পদমর্যাদা অনুধাবন করে না। কিন্তু এমন একদিন আসবে যখন তারা কেঁদে কেঁদে আমার কল্যাণময় সময়কে স্মরণ করবে।

৫৪। হে আমার জাতি! ধৈর্যসহকারে অদৃশ্যের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখ যাতে আমি আমার হস্তদ্বয় খোদার দরগায় তোমার খাতিরে সবিনয়ে প্রসারিত করি।

৫৫। তোমার দৃষ্টিতে আমার মর্যাদা যদি ধুলি-তুল্যও হয়ে থাকে, তবে ভালো কথা। ধুলি কেন, আমি তো খর-কুটার চেয়ে তুচ্ছ।

৫৬। এটি তাঁর অনুগ্রহ ও তাঁরই বদান্যতা যে তিনি আমার গুণগ্রাহী, তিনি আমায় মর্যাদা দান করেন। নচেৎ আমি তো মাত্র একটি কীট, মানব নই। একটি ঝিনুক, মতি নেই।

৫৭। তার হাত আমার অন্তরকে অপরাপর সবার দিক থেকে ঘুরিয়ে নিজের দিকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউ-ই আমার কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনায় অবশিষ্ট ছিল না।

৫৮। খোদার পরে পরে আমি মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রেমে বিভোর। এটিই যদি কুফর হয়ে থাকে তাহলে খোদার কসম, আমি শক্ত কাফির!

৫৯। আমার রন্ধ্রে রন্ধ্রে তার প্রেম অনুপ্রবেশ করেছে। আমি আমার সার্বিক বাসনা-কামনা থেকে মুক্ত এবং এ প্রেমাস্পদের প্রেমে আমি পুরোপুরি অভিসিক্ত হয়েছি।

৬০। আমি ঐশী পবিত্রতার দরগায় সত্যতার জ্বলন্ত প্রদীপ বিশেষ। তাঁরই হাত আমাকে প্রত্যেক তীব্র ঝঞ্ঝা-বায়ুর আঘাত থেকে রক্ষা করবে।

৬১। আকাশ সর্বক্ষণ আমার সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান করে। কাজেই মর্তবাসীর না মানার দরুন আমার আবার কিসের দুঃখ?!

৬২। খোদার কসম! আমি আমার প্রভু-প্রতিপালকের পক্ষ থেকে নূহের নৌকা-তুল্য। যে ব্যক্তি আমার নোঙর থেকে দূরে থাকে সে নিঃসন্দেহে হতভাগ্য।

৬৩। যে-আগুন আখেরী যুগের আঁচল পুড়িয়ে দিয়েছে, খোদার কসম! আমি সেটির প্রতিকার ও চিকিৎসার জন্য 'কওসার-নহর (নদ)' স্বরূপ।

৬৪। আমি রসূল নই, (নতুন বিধান বাহী) কোন কিতাবও আনয়ন করি নি। তবে অবশ্য আমি 'মুল্‌হাম' (ঐশীবাণী প্রাপ্ত) এবং খোদা তা'লার পক্ষ থেকে প্রেরিত সতর্ককারী।

৬৫। হে আমার প্রভু-প্রতিপালক! আমার উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের দিকে প্রীতি ও স্নেহভরে দৃষ্টিপাত কর, তোমার রহমত ও করুণার হাত ছাড়া আর কে-ই-বা আমার সাহায্যকারী?!

৬৬। আমার প্রাণ মুহাম্মদ মোস্তফা (সা.)-এর ধর্মের পথে উৎসর্গীকৃত। এটাই আমার অন্তরের লক্ষ্য ও বাসনা। হায়! এ দ্বারা আমি যেন অভিসিক্ত হই। (চলবে)

ভাষান্তর : **মওলানা আহমদ সাদেক মাহমুদ**

মুরব্বী সিলসিলাহ্‌ (অব.)

জুমুআর খুতবা

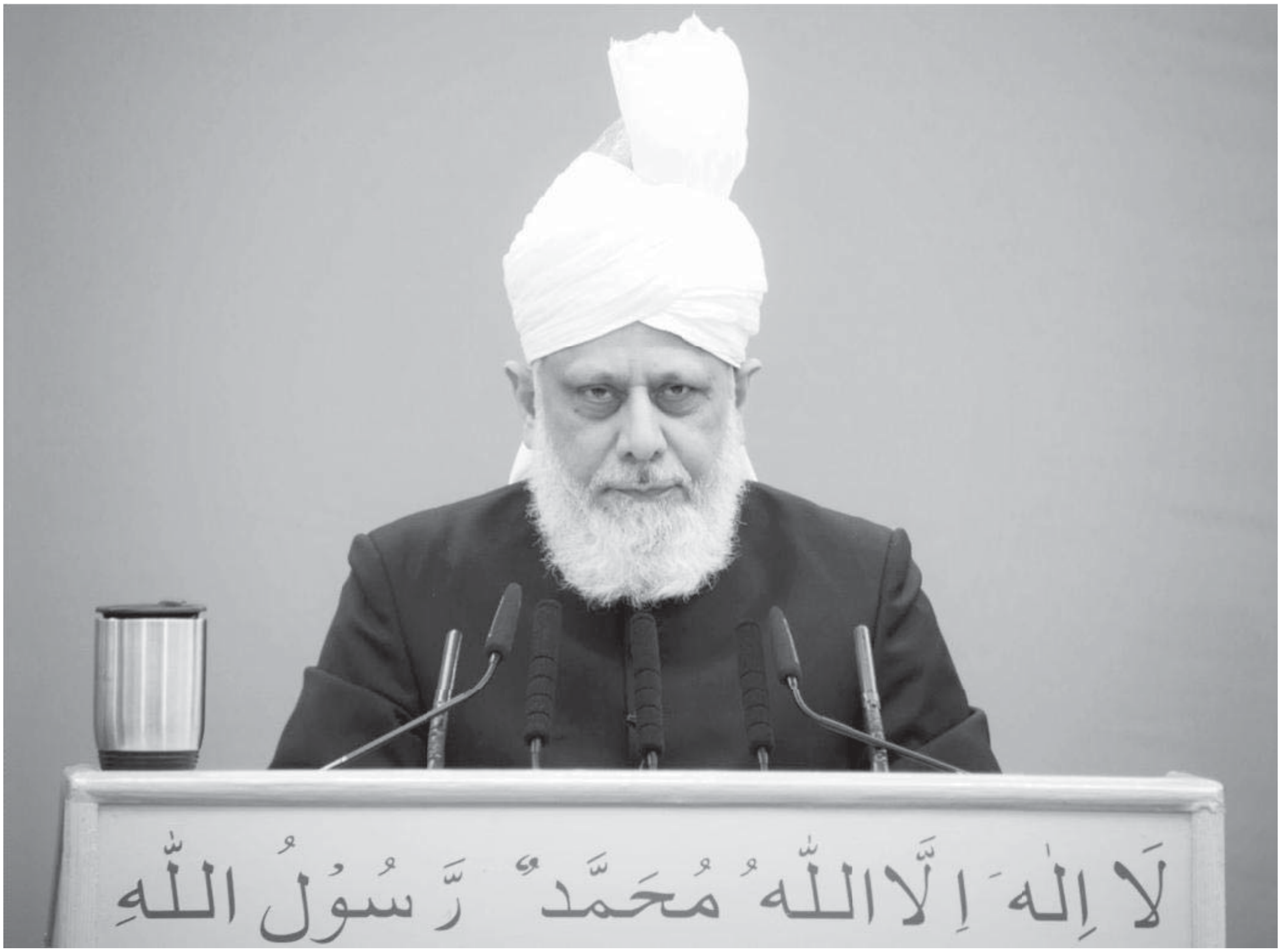

লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৯ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখের জুমুআর খুতবা

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ، وَ اَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ، اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ،
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۞ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ ۞ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَ اِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ ۞
اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ ۞ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ ۞ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ ۞

তাশাহুদ, তাউয, তাসমিয়া এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন, আল্লাহ্ তা'লা গুপ্ত বা প্রচ্ছন্ন কিন্তু তাঁর পবিত্র শক্তির মাধ্যমেইতাঁকে চেনা যায়। দোয়ার মাধ্যমে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়। কেউ রাজা বা রাজাধিরাজ আখ্যায়িত হলেও কোন না কোন সময় সে অবশ্যই সমস্যার সম্মুখীন হয় আর এমন ক্ষেত্রে মানুষ সম্পূর্ণরূপেদিশেহার ও অসহায় হয়ে পড়ে এবং বুঝে উঠতে পারে না, এখন কি করা উচিত, তখন দোয়ার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বহু জায়গায় বিভিন্ন ভাবে এবং বিভিন্ন আঙ্গিকে এর গুরুত্ব

স্পষ্ট করেছেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাহাবীগণ এই বিষয়ের এতটা বুৎপত্তি এবং জ্ঞান অর্জন করেছেন এবং তাঁর সাহচর্যের কল্যাণে দোয়ার প্রতি তাদের এমন দৃঢ় বিশ্বাস ও এমন ঈমান ছিল যে, অ-আহমদীদের ওপরও এর সুগভীর প্রভাব ছিল। ভিন ধর্মী হলেও আহমদীদের সাথে যাদের সম্পর্ক ছিল তারা বুঝতো, এদের দোয়া গৃহীত হয়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেন, একবার হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সন্নিধানে একটি ঘটনা শোনানো হয় যা শুনে তিনি প্রাণ খুলে হেসে উঠেন। এটি হযরত মুন্সী আরুঢ়া খান সাহেবের ঘটনা। হযরত মুন্সী সাহেব প্রথম দিকে ঘন-ঘন কাদিয়ান আসতেন বা তার অনেক বেশিযাতায়াত ছিল। পরে যেহেতু তার ওপর অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত হয়েছিল তাই তিনি খুব একটা ছুটি পেতেন না বা ছুটি পাওয়া কঠিন ছিল কিন্তু তারপরও প্রায় সময়ই তিনি কাদিয়ান আসতেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাদের মনে আছে যখন আমরা ছোট বালক ছিলাম তখন তার আগমন এমনই মনে হতো যেভাবে দীর্ঘ দিনের বিচ্ছিন্ন কোন ভাই বছরান্তে এসে তার কোন স্বজনের সাথে সাক্ষাৎ করছে। যদিও তিনি ঘন ঘন আসতেন তবুও তার সাথে এমন আন্তরিকতা ও নিষ্ঠার সাথে সাক্ষাৎ হতো যেন বহু বছর পর দেখা হচ্ছে বা সাক্ষাৎ হচ্ছে। ঘটনা বর্ণনাকারী যিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বৈঠকে এই ঘটনা বর্ণনা করছেন তিনি বলেন, মুন্সী আরুঢা খান সাহেব এমন মানুষ যিনি ম্যাজিস্ট্রেটকেও ভীত এবং ত্রস্ত রাখেন।

তিনি শোনান, একবার তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে বলেন, আমি কাদিয়ান যেতে চাই, আমাকে ছুটি দিন। ম্যাজিস্ট্রেট তাঁকে ছুটি দিতে অস্বীকার করেন। সে সময় হযরত মুন্সী সাহেব সেশন জজের অফিসে কর্মরত ছিলেন। তিনি বলেন, কাদিয়ান আমি অবশ্যই যাব, আপনি আমাকে ছুটি দিন। ম্যাজিস্ট্রেট বলেন, এখন কাজ অনেক তাই আপনাকে ছুটি দেয়া সম্ভব নয়।মুন্সী সাহেব বলেন, ঠিক আছে আপনার কাজ হোক,আপনি বলছেন অনেক কাজ আছে, কাজ করান, আমাকে ছুটি না দেন কিন্তু আজ থেকে আমি অভিশাপ দেয়া আরম্ভ করবো, আপনি যেই কাজের কথা বলছেন আপনার সেই কাজ যেন কখনও সমাধা না হয়। আপনি যদি যেতে দিতে না চান না দিন। অবশেষে ম্যাজিস্ট্রেটের এমন কোন ক্ষতি হয়ে যায় যার ফলে তিনি চরমভাবে ভয় পেয়ে যান। এরপর সেই ম্যাজিস্ট্রেটের ওপর যে প্রভাব পড়ে তাহলো, শনিবার আসলেই ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের অন্যান্য কর্মচারীদের বলতেন, আজকে তাড়াতাড়ি কাজ গুটিয়ে নিও কেননা; তা না হলে মুন্সী আরুঢা খান সাহেবের গাড়ির সময় পেরিয়ে যাবে। যেই ট্রেনে তার কাদিয়ান যাওয়ার কথা সেই ট্রেন চলে যাবে, তাই তাড়াতাড়ি কাজ গুছিয়ে নিও। এভাবে যখনই মুন্সী সাহেবের কাদিয়ান আসার ইচ্ছা হতো ম্যাজিস্ট্রেট তাকে ছুটি দিয়ে দিতেন। অতএব তার দোয়ার ফলশ্রুতিতে তিনি এভাবেই ভীত-ত্রস্ত ছিলেন। অতএব এই এসব মানুষরাই নিজেদের পুণ্য এবং দোয়ার মাধ্যমে অন্যদেরও প্রভাবিত করে রেখেছিলেন আর আজও এমন বিষয়ই আমাদের সামনে রাখা উচিত এবং আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক সুদৃঢ় করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে আমি আরও কিছু কথা শোনাতে চাই যা হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন এবং আমাদের আধ্যত্মিক উন্নতি ও তরবীয়তের জন্য যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকৃতি এবং বিভিন্ন অনুভূতির মানুষ থেকে থাকে। অনেকেরই অনুভূতি প্রখর হয়ে থাকে আবার অনেকের দুর্বল। অনেকেই বিশেষ পরিস্থিতির ফলে কোন আবহাওয়ায় বা পরিস্থিতিতে অভ্যস্ত হয়ে যায় আর অনেকের জন্য সেই অবস্থায় জীবন যাপন করা কঠিন হয়ে থাকে। এক কথায় অভ্যাস না থাকার কারণে তারা সংবেদনশীল হয়ে থাকে বা তাদের স্বভাব অত্যন্ত স্পর্শকাতর হয়।

অতএব শীত, গ্রীষ্ম, সুগন্ধ এবং দুর্গন্ধের যে অনুভূতি সেটি এই অনুভব শক্তি বেশি বা কম হওয়ার সাথে ওপর নির্ভর করে যা মানুষের এসব অনুভূতি শক্তির পার্থক্যকে সুস্পষ্ট ভাবে প্রকাশ করে। এ দৃষ্টিকোণ থেকে অধিকাংশ মানুষই স্পর্শকাতর বা সংবেদনশীল হয়ে থাকে। শীত এবং গরমের অনুভূতি আর সুগন্ধ-দুর্গন্ধের অনুভূতি এবং অন্যান্য অনুভূতির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। যাদের অনুভব শক্তি নেই তারা একথা প্রমাণ করতে পারে না যে, এসব জিনিসের কোন প্রভাব নেই বা এমন জিনিসের অস্তিত্বই নেই। যারা বরফবহুল অঞ্চলে বসবাস করে বা যাদের শীত কম লাগে অর্থাৎ কিছু মানুষ এমনও হয় যারা শীতকালেও, যেখানে মানুষের পা ঠান্ডায় কাঁপে, মোটা মোজা পায়ে দিয়ে রাখে সেখানে অনেকেই আবার মোজা ছাড়াই চলাফেরা করে আর বলে, পায়ে খুব গরম লাগে। অন্যান্য অনুভূতি বা অনুভব শক্তির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রজোয্য। কিন্তু এর অর্থ এটি নয় যে, সেখানে শীত নেই বা শীতের কোন প্রভাব নেই। অধিকাংশ মানুষই স্পর্শকাতর বা সেন্সেটিভ হয়ে থাকে।

অতএব এসব জিনিসের প্রভাব অবশ্যই রয়েছে আর অধিকাংশ মানুষের ওপরই এর প্রভাব পড়ে যারফলে মানুষের মাঝে এটি প্রকাশও পেয়ে যায়। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) হযরত মসীহ্মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে এই অনুভূতি শক্তির পার্থক্যের একটি জাগতিক দৃষ্টান্তও তুলে ধরেছেন। তিনি বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, কোন শহরে কয়েকজন নাগরিক আলোচনা করছিল যে তিল খুবই গরম হয়ে থাকে, কেউ এক বাআড়াইশ' গ্রাম তিল খেতে পারবে না, খেলে তখনই অসুস্থ হয়ে পড়বে। অধিকাংশ মানুষের অবস্থা এমনই হবে। হতেই পারে না যে, কোন ব্যক্তি এক পোয়া তিল খাবে অথচ অসুস্থহবে না।

এই আলোচনা চলাকালেই একজন বলে, যদি কেউ এ পরিমান তিল খেতে পারে তাহলে আমি তাকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিব। কোন এক জমিদার (বা কৃষক) সে পথ দিয়ে যাচ্ছিল, তাদের কাঁচা জিনিস খাওয়ার অভ্যাস থাকে আবার পরিমাণেও বেশি খাওয়ারও অভ্যাস হয় কেননা তারা পরিশ্রমও করে বা কিছু প্রকৃতির মানুষ এমন হয়ে থাকে। সেই জমিদারও বড় নাছোড় প্রকৃতির ছিল বা শক্ত প্রকৃতির ছিল, সে বিস্মিত হয় এবং অবাক হয়ে তাদের কথা শুনতে থাকে। সে ভাবছিল, অদ্ভুত ব্যাপার, এমন মজার জিনিস খেলে পাঁচ রুপি পুরস্কারও পাওয়া যায়!তিলও খাবে আবার পাঁচ রুপিপুরস্কারও পাবে। সে এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করে, ডাল সহ খেতে হবে নাকি ডাল ছাড়া। এটি জিজ্ঞেস করার কারণ হলো, তার বোধগম্য হচ্ছিল না যে, ডাল ছাড়া তিল খেলে পাঁচ রুপি পুরস্কার কীভাবে পেতে পারে? সে ডাল সহ খাওয়ার জন্যও প্রস্তুত ছিল অথচ যারা কথা বলছিল তারা এই পরিমাণ তিল খাওয়া অসম্ভব মনে

করছিল। দেখ! এই উভয় শ্রেণীর অনুভূতির মাঝে কত বড় পার্থক্য। একটি শ্রেণী এমন যারা এক পোয়া তিল খাওয়াকেও অসম্ভব মনে করছিল আর একজনভাবছিল, শাখা বা ডাল ছাড়া খাওয়া তো খুবই সামান্য ব্যাপার, এরফলে কীভাবে পাঁচ রুপি পুরস্কার পাওয়া সম্ভব হতে পারে?

অতএব পৃথিবীতে পার্থক্য শুধু অনুভূতিরই। আর আধ্যাত্মিক জগতেও আমরা একই বিষয় দেখতে পাই। কারও ওপর নামাযের প্রভাব বেশি পড়ে আবার কারও ওপর কম। অনেকেই এমন আছে যারা কেবল বাহ্যতঃ নামায পড়ে বা মুরগির আধার খাওয়ার অর্থাৎ ঠোকর মারার মতো নামায এবং পড়ে চলে যায়। নামাযের কোন প্রভাব তাদের ওপর পড়ে না। আধ্যাত্মিক অনুভূতি যে রয়েছে এর প্রমাণ হিসেবে তাদের স্বাক্ষ্যই গৃহীত হবে যাদের মাঝে এই অনুভূতি প্রখর বা যাদের ওপর এর প্রভাব বেশি পড়ে, যারা ইবাদত করে এবং তাদের ওপর এই ইবাদতের কার্যকারিতাও দেখা যায়

অতএব জামাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রেণীরএরূপই হওয়া উচিত যাদের অনুভূতি এমনই যারা আধ্যাত্মিক প্রভাব বেশি গ্রহণ করবে আর এরপর পৃথিবীবাসীকে অবহিত করবে যে, প্রকৃত নামায কী আর সত্যিকার ইবাদত কী এবং এর জন্য কেমন অনুভূতি সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন যা খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)ও শোনাতেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এটিকে অপর এক বরাতে বর্ণনা করেছেন কিন্তু এই ঘটনা থেকে একথাও বোঝা যায় যে, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে যখন নেক প্রকৃতির বড় বড় জ্ঞানী আলেমরা আসতেন তখন তারা তাঁর হাতে বয়আতও করতেন বা বয়আতের সৌভাগ্যও লাভ করতেন। হযরত খলীফা আউয়াল (রা.) বলতেন, একজন ধর্মীয় আলেম ছিলেন যিনি অনেক বড় একজন আরবী ব্যাকারণবিদ ছিলেন এবং গোটা ভারতে তার জ্ঞানের সুখ্যাতি ছিল।

তিনি এতটাসহজ-সরল প্রকৃতির মানুষ ছিলেন যে তাকে যারা চিনতো না তারা তাকে দেখলে মনে করতো, তিনি ঘাস কেটে আসছেন, কোন সাধারণ শ্রমজীবি মানুষ হবেন। তার নাম ছিল মৌলভী খান মালেক সাহেব। তিনি কারও কাছে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর দাবি সম্পর্কে শুনে কাদিয়ান আসেন এবং তাঁর (আ.) কথাবার্তা শুনে ঈমান আনেন। ফেরার পথে তিনি যখন লাহোর পৌঁছেন তখন তিনি মৌলভী গোলাম আহমদের সাথে সাক্ষাতের সংকল্প করেন। মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব শাহী মসজিদে দরস দিতেন এবং তিনি মৌলভী খান মালেক সাহেবের শিষ্য ছিলেন। মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবও অনেক বড় প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন আর লাহোরের মানুষ যেহেতু সম্পদশালী ছিল তাই মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবের আর্থিক অবস্থাও ছিল স্বচ্ছল । শত শত ছাত্র তার কাছ থেকে পাঠ নিতো। মৌলভী খান মালেক সাহেব যখন শাহী মসজিদে পৌঁছেন, ছাত্ররা যেহেতু জানতো না যে, ইনি কোন মাপের আলেম তাই তারা তার সাধারণ বেশ-ভূষা এবং বাহ্যিক চেহারা সুরত দেখে মনে করে যে, ইনি সাধারণ কোন মানুষ।

মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব মৌলভী খান মালেক সাহেবকে জিজ্ঞেস করেন, কোত্থেকে এলেন?তিনি বলেন, কাদিয়ান থেকে আসছি। সেই ব্যক্তি আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করেন, কাদিয়ান থেকে? ইনি বলেন, হ্যাঁ কাদিয়ান থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, কেন? ইনি বলেন, মির্যা সাহেবের শিষ্যত্ব বরণ করতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, আপনি এত বড় আলেম, তাঁর মাঝে কী এমন বৈশিষ্ট্য দেখলেন যে, তাঁর শিষ্যত্ব বরণ করতে গিয়েছেন? মৌলভী খান মালেক সাহেব তখন পাঞ্জাবীতে বলেন, তুমি নিজের চরকায় তেল দাও। তুমি তো ক্বালা ইয়াকূলুও অর্থাৎআরবীর সাধারণ ব্যাকরণও জানো না মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবও যেহেতু অনেক প্রসিদ্ধ আলেম ছিলেন তাই মৌলভী খান মালেক সাহেব যখন একথা বলেন তখন মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেবের ছাত্ররা মারাত্মকভাবে ক্ষেপে যায়। তারা মৌলভী খান মালেক সাহেবকে সম্বোধন করে বলে, এই বুড়ো! তুমি এটি কি বললে? মৌলভী গোলাম আহমদ সাহেব তখন ছাত্রদের বারণ করেন আর বলেন, ইনি যা বলছেন সত্য বলছেন।

অতএব এমন পুণ্য প্রকৃতির মানুষও ছিলেন যারা কাদিয়ান গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আত করে আসতেন, জ্ঞানের কোন গরীমাই তাদের ছিল না।

একইভাবে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে একজন আরব আসেন। এদের যেহেতু সচরাচর হাত পাতার অভ্যাস থাকে তাই কিছুদিন পর তিনি যখন এখান থেকে ফিরে যাচ্ছিলেন হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) পথখরচ হিসেবে তাকে কিছু অর্থ দেন কিন্তু সে তা নিতে অস্বীকার করে এবং বলে, আমি শুনেছিলাম আপনি মা'মূর বা প্রত্যাদিষ্ট হওয়ার দাবি করেছেন তাই এখানে এসেছিলাম, কিছু নিতে আসিনি। এটি অস্বাভাবিক বিষয় ছিল। এই এলাকায় হয়ত কোন মানুষ এমন আসেনি যে হাত পাততো না অর্থাৎ সে যুগে মানুষ এখানে এসে এমনটিই করতো।হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এটি দেখে বলেন, আপনি আরও কিছু দিন এখানে অবস্থান করুন। সেই ব্যক্তি তখন আরও কিছু দিন সেখানে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নেয়। তিনি (আ.) তাকে তবলীগ করার জন্য কয়েকজনকে নিযুক্ত করেন। বেশ কিছুদিন তার সাথে আলোচনা হয় কিন্তু তার ওপর এর কোন প্রভাব পড়েনি।

অবশেষে যারা তবলীগ করছিলেন তারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কাছে নিবেদন করেন, এই ব্যক্তি খুবই আবেগপ্রবণ, যারা হাত পাতে তাদের মতো নয়।এই ব্যক্তি সত্যের সন্ধানে আছে বলে মনে হয়, যেমনটি আমরা আজকাল যেসব আরব আহমদী হচ্ছে তাদের মাঝে এই অনুসন্ধিৎসা দেখতে পাই। তারা হুযূর (আ.)-কে অনুরোধ করেন, তারা হুযূর (আ.)-কে তার জন্য দোয়া করার অনুরোধ করেন, কেননা তবলীগ ফলপ্রসূ হচ্ছিল না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দোয়া করেন এবং তাঁকে অবহিত করা হয় যে, এ ব্যক্তি হিদায়াত লাভ করবেন অর্থাৎ সত্য গ্রহণ করবেন। আল্লাহ্ তা'লার পবিত্র মহিমা দেখুন! সেই রাতেই কোন কথায় তার ওপর এমন প্রভাব পড়ে যে, সকালে উঠেই তিনি বয়আত করেন এবং ফিরে যান। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমাকে জানানো হয়েছে হজ্জের সময়, তিনি বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধি দলকে তবলীগ করেন। একটি কাফেলা বা দল তাকে মারতে মারতে বেহুশ বা অচেতন করে ফেলতো কিন্তু চেতনা ফিরে আসলেই তিনি দ্বিতীয় কাফেলা বা দলের কাছে গিয়ে তবলীগ আরম্ভ করতেন। কাজেই আসল কথা হলো, খোদা তা'লা যখন বক্ষ উম্মোচন করেন তখনই তা

উন্মোচিত হয় আর মানুষের হৃদয়ে এমন অনুকরণীয় প্রেরণা সৃষ্টি হয় যে, তখন মানুষ কোন কিছুর প্রতিই আর ভ্রুক্ষেপ করে না।

অনুরূপভাবে তিনি আরও একটি ঘটনা বর্ণনা করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর যুগে আমেরিকায় সর্বপ্রথম একজন ইংরেজ বা একজন আমেরিকান ইসলাম গ্রহণ করেন। তার নাম ছিল আলেকজান্ডার রাসেল ওয়েব। ফিলিপাইনের আমেরিকান দূতাবাসে তিনি কাজ করতেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ইংরেজী বিজ্ঞাপন যখন ইউরোপ ও আমেরিকায় প্রচারিত হয় তখনই তার হৃদয়ে ইসলাম গ্রহণের প্রেরণা জাগে এবং তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে পত্রালাপ আরম্ভ করেন। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং ইসলাম প্রচারের জন্য নিজের জীবন উৎসর্গ করে দেন। পরে তিনি ভারতেও আসেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাতের বাসনা ব্যক্ত করেন, তিনি লাহোর বা অন্য কোন বড় শহরে এসেছিলেন, সেখানকার মৌলভীদের সাথে যখন সাক্ষাৎ করেন তখন তারা তাকে বলে, মির্যা সাহেবের সাথে সাক্ষাৎ করলে মুসলমানরা তোমাকে আর চাঁদা দিবে না। তবলীগ করতে চাও, ইসলাম প্রচার করতে চাও, তবলীগের পরিকল্পনা হাতে নিয়েছো ভালো কথা কিন্তু এর জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে কোন সহযোগিতাই পাবে না। তাদের এই বিভ্রান্তির ফলে সেই ব্যক্তি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে সাক্ষাৎ করেনি। অবশেষে চরম নৈরাশ্য নিয়ে সে এখান থেকে ফিরে যায় এমনকি মুসলমানরাও তাকে কোনরূপসাহায্য করেনি। তাকে বলা হয়েছিল, অন্যান্য মুসলমানরা তোমাকে সাহায্য করবে আর ইসলাম প্রচারের জন্য অনেক চাঁদা দিবে কিন্তু অন্যান্য মুসলমানরা তাকে কোন সাহায্যই করেনি। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মৃত্যুর সন্নিকটবর্তী সময়ে সেই ব্যক্তি মসীহ্মাওউদ (আ.)-কে পত্র লিখে এবং বলেন, আপনার উপদেশ না মেনে আমি জীবনে অনেক কষ্ট সহ্য করেছি, আপনি আমাকে বলেছিলেন মুসলমানদের মাঝে ধর্মসেবার কোন আগ্রহ নেই কিন্তু সেকথা আমি গ্রহণ করিনি। এর ফলাফল যা দাঁড়িয়েছে তাহলো, আপনার সাক্ষাৎ থেকে আমি বঞ্চিত থেকে গেলাম।

যাহোক সেই ব্যক্তি শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত মুসলমান ছিলেন আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে তার নিষ্ঠাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল। অতএব আমেরিকায় সর্বপ্রথম ইনিই ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, এখনও আমি দেখি, ইউরোপিয়ান দেশ সমূহের তুলনায় আমেরিকায় জামাতের উন্নতি বেশি হচ্ছে। যদিও কোন কোন ইউরোপীয়ান দেশেও আহমদীয়াতের বিস্তার ঘটছে আর ইউরোপও পাশ্চাত্যেরই অন্তর্গত কিন্তু আমেরিকায় উন্নতির লক্ষণাবলি বেশি দেখা যায়।

আমেরিকার জামাত এমন পুণ্যস্বভাবী লোকদের সন্ধান করবে এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর পতাকাতলে সমবেত করার চেষ্টা করবে আর এর জন্য বস্তুনিষ্ঠ এবং গঠনমূলক চেষ্টা করবে ;এটিই আমার আল্লাহর কাছে দোয়া থাকবে। হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) যে প্রত্যাশা ব্যক্ত করেছেন তা যেন বাস্তবে রূপ নেয়। একসময় আমেরিকায় অনেক মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করেছিলেন এবং দৃঢ়তার সাথে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিলেন কিন্তু তাদের অনেকেই এমন ছিলেন যাদের পরবর্তী প্রজন্ম বস্তুবাদিতার কারণে বা যোগাযোগের অভাবে অথবা অন্য কোন কারণে আহমদীয়াতের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারেনি। তাই এই উদ্দেশ্যেও জামাতের চেষ্টা করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) সন্তানদের সাথে কেমন সম্পর্ক রাখতেন, কীভাবে তাদের তরবীয়তের ব্যাপারে সচেতন ছিলেন সে সম্পর্কে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, সঠিক তরবীয়ত বা শিক্ষার রীতি সেটি যা খেলাধূলার মাধ্যমে তারা শিখে। অর্থাৎ প্রথমে বয়স যখন খুবই কম থাকে বা ছোট হয় তখন কাহিনী বা গল্প শুনিয়ে তাদের তরবীয়ত করতে হয়। বড়দের জন্য বা বয়স্কদের জন্য শুধু ওয়াজ নসীহত যথেষ্ট হলেও শৈশবে আগ্রহ ধরে রাখার জন্য কাহিনী বা গল্প শোনাতে হয়। কাহিনী মিথ্যা হওয়া আবশ্যক নয়। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও আমাদের গল্প শোনাতেন। কখনও তিনি হযরত ইউসুফের কাহিনী বর্ণনা করতেন, কখনও বা হযরত নূহের গল্প শোনাতেন আবার কোন সময় হযরত মূসার ঘটনা বর্ণনা করতেন। কিন্তু আমাদের কাছে সেগুলো কাহিনীই হতো যদিও সেগুলো ছিল সত্য ঘটনা। আলিফ লায়লায় হাসেদ ও মাহসুদের একটি কাহিনী অন্তর্ভুক্ত আছে, তাও তিনি শোনাতেন। সেটি সত্য হোক বা মিথ্যা যাইহোক না কেন তাতে এক শিক্ষণীয় দিক ছিল। অনুরূপভাবে আমরা অনেক প্রবাদ তাঁর কাছে শুনেছি যা কাহিনীর সাথে সম্পর্ক রাখে। অতএব শৈশবে শিক্ষার উত্তম উপায় হলো, গল্প শোনানো। যদিও কোন কোন গল্প অর্থহীন এবং বাজে হয়ে থাকে কিন্তু কল্যাণকর এবং চারিত্রিক শক্তিকে দৃঢ় করার এবং শিক্ষণীয় কাহিনীও গল্পও রয়েছে। যখন সন্তান- সন্ততির বয়স খুবই কম থাকে তখন এভাবেই তাদের শিখানো হয়। এরপর কিছুটা বড় হলে শিক্ষা এবং তরবীয়তের উৎকৃষ্ট উপায় হলো, খেলাধূলা। অনেক সময় পিতা-মাতারা আমাদের কাছে আসে যে, বাচ্চারা অনেক বেশি খেলাধূলা করে। যদি টেলিভিশনে না খেলে, বাহিরে গিয়ে যদি খেলে থাকে তাহলে তাদের খেলতে দেয়া উচিত। বই-পুস্তকের সাথে যেসব বিষয়ের জ্ঞান দেয়া হয় খেলাধূলার মাধ্যমেও কার্যতঃ তাই শিখানো হয়ে থাকে কিন্তু কাহিনী বা গল্পের যুগ খেলাধূলার পূর্বের যুগ।

অতএব পিতাদের উচিত সন্তানদের সময় দেয়া। পিতা-মাতা উভয়ে সম্মিলিতভাবে যদি সন্তান-সন্ততির তরবীয়তের ওপর জোর দেয়, তাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখে, তাদের সঠিক তরবীয়ত করে, তাদেরকে নিজেদের সাথে সম্পৃক্ত করে তাহলে তরবীয়তের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাওয়ার কথা যা নিয়ে সচরাচরপিতা-মাতারা অভিযোগ করে থাকেন। আরেক জায়গায় হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, শৈশবে শিশুদের যেসব কাহিনী বা গল্প শোনানো হয় তার উদ্দেশ্য হয়ে থাকে হৈ-চৈ , পিতা-মাতাকে বিরক্ত করা এবং সময় নষ্ট করা থেকে তাদেরকে বিরত রাখা। যদি এমন কাহিনী শোনানো হয় যা পরবর্তী জীবনের জন্যও কল্যাণকর তাহলে এটি কতই না ভালো উত্তম।

আজকাল বাচ্চারা যেন হৈ-চৈ না করে এবং পৃথক বসে থাকে এই উদ্দেশ্যে পিতা-মাতারা তাদের হাতে হয়ত আইপ্যাড ধরিয়ে দেয় বা কম্পিউটার বা টেলিভিশনের সামনে বসিয়ে দেয় আর তাতে যদি কোন ভালো কাহিনী বা গল্প চলতে থাকে তাহলে ঠিক আছে কিন্তু প্রায় সময় এতে কেবল অযথা সময়ই নষ্ট হয়। ছোট বয়সের

শিশুদের তো এমনিতেও এসবের সামনে বসিয়ে রাখা উচিত নয় কেননা; দীর্ঘক্ষণ বসে থাকলে একেতো চোখের ওপর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে, দ্বিতীয়তঃ ডাক্তারদের কথা অনুযায়ী এতে দু'বছরের কম বয়সের শিশুদের চিন্তাধারাও বদলে যায় আর তারা এরপর এক দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং এর অনেক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে থাকে।

যাহোক হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের যেভাবে কাহিনী শোনাতেন এতে সেই সময় বা সেই বয়সে কাহিনী শোনানোর যে উপকারিতা রয়েছে তাও আমাদের লাভ হতো। তখন তিনি যদি আমাদের এসব গল্প না শোনাতেন তাহলে আমরা হৈ-চৈ করতাম আর তিনি কাজ করতে পারতেন না। তাই আমাদের কাহিনী শুনিয়ে চুপ করানো আবশ্যক ছিল আর এ কারণেই রাতের বেলা আমাদের আগ্রহ ধরে রাখার জন্য তিনি (আ.) যখনই সময় পেতেন আমাদের কাহিনী শোনাতেন যেন আমাদের ঘুমিয়ে পড়ার পরতাঁর কাজের সুযোগ হয়। বাচ্চাদের জানা থাকে না যে, তাদের পিতামাতা কত বড় কাজ করছেন। তাকে আগ্রহের উপকরণ যদি সরবরাহ না করা হয় তাহলে সে হৈ-চৈ করে আর কাহিনী বা গল্প শোনানোর উদ্দেশ্য হয়ে থাকে তাদের ঘুম পাড়ানো। সে যুগে এসব বিষয় ছিল না, পিতা-মাতা পরিশ্রমই করতেন। কিন্তু আজকাল, আমি যেমনটি বলেছি, কিছু এমন জিনিস সামনে এসে গেছে যে কারণে প্রথমতঃ পিতা-মাতা তরবীয়তের পিছনেপরিশ্রম করে না, দ্বিতীয়তঃ সন্তানদের সাথে সম্পর্কের গভীরতা হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, কাহিনীর প্রয়োজনীয়তা এমন একটি বিষয় যা সবাই স্বীকার করেছে, সেই প্রয়োজন সাময়িকই হোক না কেন। বাচ্চার তখন শুধু এতটা উপকার হয় যে, এর প্রতি বাচ্চার আগ্রহ জন্মায়, সে নিবিড় চিত্তে এটি শোনার পর ঘুমিয়ে পড়ে। পিতা-মাতার উদ্দেশ্য হলো, সময়ের সাশ্রয়। তাই বাচ্চাকে বিছানায় শুয়ে গল্প শোনায় আর একজন গল্প শোনায় এবং দ্বিতীয়জন কাজে লেগে থাকে বা একজন শোনালেও বাকী পরিবারের সবাই নির্বিঘ্নে কাজ করে। এই সময় যদি বাজে এবং অর্থহীন কাহিনী শোনানো হয় তাহলেও এই লক্ষ্য অর্জন হয় কিন্তু আমরা এতে সন্তুষ্ট নই বরং এমন কাহিনী শোনানো উচিত যেন তখনও উপকার হয়।

বন্ধুত্ব সব সময় এমন হওয়া উচিত যা কোনভাবে ধ্বংসের কারণ হবে না, এই বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) একটি ঘটনা বর্ণনা করেন। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলতেন, এটি একটি পুরোনো কাহিনী। এক ব্যক্তির ভাল্লুকের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক ছিল, সে সেটিকে পুষেছিল বা কোন সমস্যার সময় সেটিকে সাহায্য করেছিল তাই সেই ভাল্লুক তার কাছে এসে বসে থাকত। যদিও এটি একটি গল্প, যা সত্য তুলে ধরার উদ্দেশ্যে বানানো হয়েছে। যদিও এমনও হয়ে থাকে, মানুষ ভাল্লুক ইত্যাদি পালার পর সেগুলোকে পোষ মানায় কিন্তু আমি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পক্ষ থেকে যখন কোন গল্প শোনাই তখন তা কেবল একটি কাহিনীই হয়ে থাকে যা সত্য স্পষ্ট করার উদ্দেশ্য শোনানো হয়। আমি এই কথাটি স্পষ্ট করছি এ জন্য যে, শত্রুরা হয়তো এই আপত্তিও করবে, এরা এমন নির্বোধ মানুষ যারা মনে করে, ভাল্লুক মানুষের কাছে এসে বসে। এসব পুরোনো কাহিনী শিখার উদ্দেশ্য বলা হয়ে থাকে।

এর অর্থ হলো, এমন প্রকৃতির মানুষও থেকে থাকে। কতিপয় মানুষ এমন প্রকৃতির অধিকারী যারা এমনই কাজ করে অর্থাৎ পশুর মত, যেমন পুরোনো বিভিন্ন গল্পে বাদশাহ্‌র রাজ দরবারকে সিংহের রাজ দরবার এবং তার রাজন্যবর্গকে অন্যান্য পশু হিসেবে বর্ণনা করা হয়। আর এভাবে সেই বাদশাহ্‌ও অর্থাৎ যার সম্পর্কে কথা হয় সেও বড় মনোযোগসহকারে তা পড়ে। যাহোক একটি ভাল্লুক সেই ব্যক্তির বন্ধু ছিল এবং তার কাছে আসত। একদিন তার মা অসুস্থ হয়ে পড়লে সে পাশে বসে বাতাস করছিল এবং মাছি তাড়াচ্ছিল। দৈবক্রমে কোন প্রয়োজনে তাকে বাহিরে যেতে হয়। সে ভাল্লুককে বলে, তুমি মাছি তাড়াও, আমি আসছি। ভাল্লুক আন্তরিকভাবে সেই কাজ আরম্ভ করে কিন্তু মানুষ এবং পশুর কাজের মধ্যে পার্থক্য থেকে থাকে। পশু এত সহজে হাত নাড়াতে পারে না যত সহজে মানুষ নাড়াতে পারে, সে মাছি তাড়ায় কিন্তু মাছি আবার এসে বসে পড়ে, সে আবার তাড়ায় আবার এসে বসে, সে ভাবলো, মাছির এভাবে বারবার এসে বসা আমার বন্ধুর মায়ের জন্য বড়ই কষ্টকর প্রমাণিত হচ্ছে, এর সমাধান হিসেবে সে একটা বড় পাথর উঠিয়ে ছুড়ে মারে যেন মাছি মারা যায়। মাছি তো মরে যায় কিন্তুএকই সাথে তার মাও পিষ্ট হয়। এটি নিছক একটি উদাহরণ, এর অর্থ হলো, অনেক নির্বোধ কারও সাথে বন্ধুত্ব করে, কিন্তু বন্ধুত্বের রীতি জানে না।

অনেক সময় বন্ধু মানুষের হিতাকাঙ্খী হলেও তা ধ্বংস ডেকে আনার কারণ হয়। যদি বন্ধু সত্যিকার অর্থে কল্যাণকামী হয় তাহলে সে কখনও ঈমানহীনতার দিকে নিয়ে যেতে পারে না বরং সেদিকে আকৃষ্ট দেখলে বন্ধুকে বাধা । মহানবী (সা.) বন্ধুত্বের কত অনুপম চিত্র অঙ্কন করেছেন দেখুন!তিনি বলেন, নিজ ভাইয়ের সাহায্য কর, সে যালেম হোক বা মযলুম অর্থাৎ অত্যাচারী হোক বা অত্যাচারিত, বন্ধুকে সাহায্য কর। সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! এর অর্থ কি, আমরা কি অত্যাচারীকেও সাহায্য করব? তিনি বলেন, সত্যিকার অর্থে অত্যাচারীর হাতকে অত্যাচার থেকে বিরত রেখে তুমি তাকে সাহায্য কর। এমন নয় যে, বন্ধুকে সর্বাবস্থায় সাহায্য করবে বা তার ইচ্ছার দাসত্ব করবে বরং আসল বন্ধুত্ব হলো, বন্ধুর কল্যাণার্থে তার বিরুদ্ধেও যদি যেতে হয় যাও, এমনটি যদি না কর তাহলে তাকে ধ্বংস করছ বা তার ক্ষতি করছ । অধিকাংশ মানুষ এই বিষয়টি বুঝে না।

হযরত মুসলেহ্‌মাওউদ (রা.) একটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। কাদিয়ানের দৃষ্টান্ত এটি। এক ব্যক্তির আরেকজনের সাথে ঝগড়া হয়, এমন সময় তার এক বন্ধু চিন্তা-ভাবনা ছাড়াই অন্যায়ভাবে বন্ধুত্বের দায়িত্ব পালনের জন্য বা বন্ধুত্বের দাবিরনামে সেই ঝগড়ায় অংশ নেয়। প্রথমজন তার সহজাত পুণ্যের কারণে নিজের জায়গায় ফিরে আসে, এই ঝগড়া বিবাদের অবসান হয় কিন্তু সেই বন্ধু যে তার খাতিরে এই ঝগড়ায় অংশ নিয়েছিল সে মুরতাদ হয়ে যায়। অতএব বন্ধুত্ব যেখানে খোদার নৈকট্যের কারণ হয়ে থাকে, বন্ধুর কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে, সেখানে অনেক সময় নিজের জন্য ধ্বংস ডেকে আনে আর বন্ধুদেরও ধ্বংস ডেকে আনে। তাই এই দৃষ্টিকোণ থেকে বন্ধুত্বের দাবি রক্ষার জন্য কাণ্ড-জ্ঞানও খাটানো উচিত আর আবেগ অনুভূতিকেও নিয়ন্ত্রণ করা চাই।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, আমার মনে আছে হযরত মসীহ্‌মাওউদ (আ.) শোনাতেন, একটি ভাল্লুক ছিল। এক ব্যক্তির সাথে তার বন্ধুত্ব ছিল, তার স্ত্রী সব সময়

তাকে এই বলে খোঁচা দিত, তুই আবার কেমন মানুষ যে, ভাল্লুকের সাথে তোর বন্ধুত্ব! এক দিন তার মর্মপীড়াদায়ক কথাবার্তা এতটাই সীমা ছাড়িয়ে যায় এবং এত উচ্চস্বরে সেকথা বলতে আরম্ভ করে যে, ভাল্লুকও তা শুনে ফেলে। ভাল্লুক তখন একটি তরবারি হাতে নেয় এবং তার বন্ধুকে বলে, এই তরবারি দিয়ে আমার মাথায় আঘাত করো। এই কাহিনী শুনে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই, এটি কেবল একটি কাহিনী। উদ্দেশ্য হলো একথা বুঝানো যে, কিছু মানুষের চেহারা ভাল্লুকের মত হয়ে থাকে কতকের মাঝে মানবতা থাকে, সবার প্রকৃতি পৃথক পৃথক হয়ে থাকে। অনেকে ভাল্লুক প্রকৃতির হয়ে থাকে, অনেকে মানুষ আখ্যায়িত হলেও সত্যিকার অর্থে পশু হয়ে থাকে। সেই ব্যক্তি এড়িয়ে যাওয়ার অনেক চেষ্টা করে কিন্তু সে বলে, আমার মাথায় মারতেই হবে, অবশেষে তরবারি নিয়ে সে ভাল্লুকের মাথায় আঘাত করে। সে রক্তরঞ্জিত হয়ে জঙ্গলের দিকে চলে যায়। এক বছর পর আবার বন্ধুর কাছে আসে এবং বলে, আমার মাথা দেখ! কোথাও আঘাতের চিহ্ন আছে কি? সে দেখে যে, আঘাতের কোন নাম গন্ধও ছিল না। তখন সেই ভাল্লুক বললো, জঙ্গলে বিভিন্ন বনজ গাছপালা রয়েছে, আমি চিকিৎসা করেছি যার ফলে ক্ষত ঠিক হয়ে গেছে কিন্তু তোমার স্ত্রীর মর্মপীড়াদায়ক কথা-বার্তা যা আমার বিরুদ্ধে সে বলতো তার ক্ষত আজও অম্লান। অনেক সময় মুখের জখম তরবারীর জখম থেকেও ভয়াবহ হয়ে থাকে আর এই তরবারী অর্থাৎ জিহ্বা এমনভাবে আঘাত হানে যে, মানুষ তা ভুলতে পারে না।

তাই সামাজিক শান্তি এবং নিরাপত্তার জন্য, পরস্পরের আবেগ অনুভূতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার প্রতিও সবার দৃষ্টি থাকা উচিত আর অনর্থক কথার এমন তীর ছোড়া উচিত নয় যার ক্ষত কখনো সারে না। সব আহমদীকে সর্বদা এ কথাটি স্মরণ রাখা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে গ্রহণ করার পর বা তাঁকে মানার পর প্রত্যেক আহমদীর উচিত নিজের ঈমানের সুরক্ষা করা। অনেক সময় তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিষয় ঈমানকে ধ্বংস করে, যেমনটি আমি বলেছি, এক ব্যক্তি বন্ধুকে সাহায্য করার নামে পরে নিজের ঈমান হারিয়ে বসে এবং মুরতাদ হয়ে যায়। অনেক সময় খোদার ইচ্ছা-পরিপন্থি কথা বললে ঈমান ধ্বংস হয়ে যায়। তাই সব সময় আমাদের আত্মজিজ্ঞাসায় লেগে থাকা উচিত।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ বলেন যে, হযরত মূসার কাহিনীতে এর দৃষ্টান্ত আমরা দেখতে পাই। হযরত আকদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এই কাহিনী বারবার শোনাতেন। বলা হয়, হযরত মূসা (আ.) যখন মিশর থেকে বের হন, পথিমধ্যে তিনি আমালিকদের মুখোমুখী হন। এটি হযরত নূহের সন্তান-সন্ততির মধ্য থেকে একটি গোত্র ছিল যারা ইসরাঈলীদের ঘোর বিরোধী ছিল। যাহোক তাদের বাদশাহ্‌র আশঙ্কা হয় যে, আমরা পরাজিত হব। সে দেশে একজন পুণ্যবান ব্যক্তি বসবাস করতেন। বাদশাহ্ তার কাছে দোয়ার অনুরোধ করেন। সেই বুযূর্গ দোয়া করেন, তখন আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ইলহাম হয়, মূসা আল্লাহ্ তা'লার নবী, তাঁর বিরুদ্ধে দোয়া করা উচিত নয়। সেই পুণ্যবান ব্যক্তি বাদশাহ্‌কে বলেন, মূসার বিরুদ্ধে দোয়া করা সম্ভব নয়। বাদশাহ্ যখন জানতে পারলো যে, তার কোন কথা কোন কাজে আসছে না তখন সে সেই চক্রান্তই করেছে যা আদমকে জান্নাত থেকে বহিষ্কার করার জন্য শয়তান করেছিল, সব সময় শয়তানের এই রীতিই চলে আসছে, হাওয়ার মাধ্যমে প্রথমবার বিভ্রান্ত করেছিল। সেও মূসার বিরুদ্ধে দোয়া করানোর জন্য সেই পুণ্যবান ব্যক্তির স্ত্রীকে অনেক গহনা-অলঙ্কারবানিয়ে দেয়। সেই স্ত্রী স্বামীকে দোয়ার জন্য বলে। তিনি বলেন, মূসা খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত নবী, তাঁর বিরুদ্ধে অভিসম্পাত করা সম্ভব নয়, আমি দোয়া করেছিলাম কিন্তু সেখান থেকে অর্থাৎ আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে উত্তর এসে গেছে। কিন্তু তার স্ত্রী জোর দিতে থাকে, অবস্থা একই থাকা তো আবশ্যক নয় তুমি অভিসম্পাত কর, অবশেষে সেই বুযূর্গ সম্মত হয়। তারা তাকে এক জায়গায় নিয়ে যায়, তিনি বলেন, এখানে আমার মন থেকে অভিশাপ বের হচ্ছে না; এভাবে দু' তিনটি স্থান পরিবর্তন করা হয়। তার ঈমান যেহেতু নষ্ট হওয়ার ছিল, তাই সে অভিশাপ করে বা অভিশাপ দেয়।

বলা হয়, অভিশাপ দিতেই মূসার জাতিতে ধ্বংসযজ্ঞ নেমে আসে কেননা; তার পূর্বের ঈমানের কিছু না কিছু প্রভাব তো ছিলই আর মূসার জাতিতে ঈমানের যে দুর্বলতা ছিল সেই দুর্বলতার কারণে তারা সাময়িকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। আর অপর দিকে বুযূর্গের ঈমান কবুতরের মত উড়ে যায়। তার ঈমানও নষ্ট হয় কেননা; আল্লাহ্ তা'লা বলেছিলেন দোয়া করবে না কিন্তু সে অভিসম্পাত দিয়েছে, এর শাস্তি স্বরূপ মূসার বিরুদ্ধে দোয়ার ফলে তার বুযূর্গ হিসেবে যে মর্যাদা ছিল তাও হারিয়ে যায় আর খোদার দরবারে যে নৈকট্য ছিল তাও হারিয়ে যায়।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন,সন্দেহ নেই যে এটি একটি কাহিনীমাত্র কিন্তু এর অর্থ হলো, যেভাবে কবুতর হাত থেকে উড়ে যায় অনুরূপভাবে ঈমানও সেই ব্যক্তির হৃদয় থেকে বেরিয়ে যায়। ঈমান অনেক পরিশ্রমের পর লাভ হয় আর একটি মাত্র বাক্যের মাধ্যমে নষ্ট হয়ে যায়। ঈমান আনা বা কোন কিছু গ্রহণ করা আর এরপর ঈমানে উন্নতি করার জন্য অনেক পরিশ্রম করতে হয় কিন্তু একটা সামান্য কথা যা একটি বাক্যের সমান হয়ে থাকে যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছার পরিপন্থী হয়ে থাকে, তার মাধ্যমেই ঈমান নষ্ট হয়ে যায়। তাই মানুষের উচিত সব সময় সাবধান থাকা এবং আত্মজিজ্ঞাসায় লেগে থাকা।

যিকরে ইলাহী বা খোদার স্মরণের প্রতি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রেক্ষাপটে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কোন পুণ্যবান ব্যক্তির এই কথা শোনাতেন যে, 'দস্ত দরকার দিল বা ইয়ার' অর্থাৎ মানুষের হাত কাজে রত থাকা উচিত কিন্তু তার হৃদয় লেগে থাকা উচিত খোদার স্মরণে। অনুরূপভাবে একজন পুণ্যবান মানুষ সম্পর্কে জনশ্রুতি রয়েছে, কেউ তাকে জিজ্ঞেস করে, আমি কতবার আল্লাহ্‌তা'লাকে স্মরণ করবো। তিনি বলেন, প্রেমাস্পদের নাম গুণে গুণে নেয়া কীভাবে যুক্তিযুক্ত হতে পারে? আসল যিকর সেটি যা অগণিত হয়ে থাকে কিন্তু একটি সময় নির্ধারণ করার উপকারী দিক হলো, মানুষ তখন অন্য কাজ থেকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক হয়ে প্রেমাস্পদকে স্মরণ করবে। এই উভয় অবস্থা যেহেতু গুরুত্বপূর্ণ ও আবশ্যক তাই সঠিক রীতি হলো, নির্দিষ্ট সংখ্যায় আর নির্দিষ্ট ভাবেও যিকরে ইলাহী করা উচিত। আজকাল বস্তুবাদিতায় নিমজ্জিত মানুষ এ কথাটি বুঝে না, তাই অবশ্যই তাদের সময় বের করা উচিত। আর অনির্দিষ্টভাবেও চলাফেরায়, উঠা-বসার ক্ষেত্রে সময় করে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা উচিত। তাঁর অনুগ্রহ এবং কৃপারাজির কথা বার বার উল্লেখ করা উচিত।

ধর্মীয় কথা গভীর মনোযোগ সহকারে শোনা, সেগুলো স্মরণ রাখার চেষ্টা করা আর সে অনুসারে কাজ করা একজন আহমদীর লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। খুতবা শোনা বা বক্তৃতা শোনা বা কোন অধিবেশনে বা বৈঠকে অংশগ্রহণ বা সাময়িকভাবে কোন পুস্তক-পুস্তিকা পাঠ করা, সাময়িক প্রভাব গ্রহণ করা মাত্র। সেটিকে স্মরণ না রাখা বা সে অনুসারে কাজে পরিবর্তন না আনা মানুষের কোন কাজে আসে না।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার মহিলাদের মাঝে তাদের তরবীয়তের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা প্রদান আরম্ভ করেন এবং অনবরত বেশ কয়েক দিন বক্তৃতা দেন। একদিন তিনি বলেন, মহিলাদের পরীক্ষাও নেয়া উচিত, যেন বুঝা যায়, তারা আমাদের কথা কতটা তারা বুঝে উঠতে পারছে। বাহির থেকে একজন মহিলা এসেছিলেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকে জিজ্ঞেস করেন, আট দিন হয়ে গেছে বক্তৃতা করছি, এসব বক্তৃতায় আমি কি বর্ণনা করেছি তা আমাকে একটু বল। সেই মহিলা বলেন, আল্লাহ্ এবং রসূলের কথাই আপনি বলে থাকবেন বা বর্ণনা করেছেন এছাড়া আর কী বলেছেন? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই উত্তর শুনে এতটাই দুঃখ ভারাক্রান্ত হন যে, তিনি বক্তৃতা প্রদান করা বন্ধ করে দেন এবং বলেন, আমাদের মহিলাদের মাঝে এমন ঔদাসীন্য বিরাজমান যে, মনে হয় যেন এখনও তারা অতি প্রারম্ভিক শিক্ষারই মুখাপেক্ষী। উন্নত পর্যায়ের আধ্যাত্মিক কথা বোঝার সামর্থই তাদের নেই।

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, কোন কোন পুরুষের অবস্থাও এমনই বরং আমি তো বলবো, অনেক পুরুষের অবস্থাই এমন। কোন কোন স্থানে এর বিপরীত চিত্রও দেখা যায়, মহিলারা পুরুষের চেয়ে বেশি জ্ঞান রাখেন আর তারা যখন স্বামীদের স্মরণ করান যে, এই হলো ধর্মের কথা, এটি মেনে চল, অনেক সময় অভিযোগ আসে, স্বামীরা তখন উত্তর দেয়, ধর্ম তো অনেক কিছু বলে, আমরা এভাবেই থাকবো আর সেভাবেই করব যেভাবে ইচ্ছা হয়। স্মরণ রাখা উচিত, এমন ধৃষ্টতা যখন মাথায় বা হৃদয়ে ভর করে নেয় তখন অধঃপতন দেখা দেয়, মানুষ ধর্ম থেকে অনেক দূরে ছিটকে পরে। যাহোক হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) বলেন, পক্ষান্তরে সাহাবীদের দেখ! কীভাবে দিবারাত্র তাঁরা রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর কথা শুনতেন এবং তা কর্মে রূপায়িত করার জন্য সোচ্চার থাকতেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ বা যত বড় কথাই হোক না কেন সেগুলো গ্রহণ করে তাঁরা তা পৃথিবীতে বিস্তৃত করেছেন আর এর ওপর আমল করেও দেখিয়েছেন। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক-পুস্তিকা পড়া এবং সেগুলো থেকে লাভবান হওয়াও জামাতের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বাবলীর অন্তর্গত। কিন্তু স্মরণ রেখো! শুধু উপভোগের উদ্দেশ্যে এমনটি করো না বরং তা থেকে উপকৃত হওয়া এবং আমল বা কর্মে রূপায়িত করার জন্য এদিকে মনোযোগ দাও। তোমরা যদি উপভোগের উদ্দেশ্যে সারা কুরআনও পড় তাতে কোন লাভ হবে না কিন্তু যদি খোদার গুণাবলী সম্পর্কে প্রণিধান করে তাঁর ভালোবাসার প্রেরণায় একবারও যদি সুবহানাল্লাহ্ বল তাহলে তা-ই তোমাকে অনেক ওপরে নিয়ে যাবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একবার মজলিসে বা বৈঠকে বলেন, অনেক সময় আমরা তসবীহ্ করি, একবার সুবহানাল্লাহ্ বলেই আমরা অনেক ওপরে পৌঁছে যাই। আমি সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলাম না, একজন যুবক এই কথা শুনে সেখান থেকে আমার কাছে আসে এবং বলে, জানি না আজকে হুযূর কি বলেছেন এই বাক্যের মাধ্যমে? তার অভিজ্ঞতা ছিল না কিন্তু আমি বয়সের সেই অংশেও অভিজ্ঞতা রাখতাম, অথচ আমার বয়স তখন মাত্র ১৭ বা ১৮ বছর হবে। তার কথা শুনে আমি বললাম, হ্যাঁ, এমনটি হয়। সে বললো, কীভাবে? আমি বললাম, বেশ কয়েক বার আমি দেখেছি, আমি শুধু একবারই সুবহানাল্লাহ্ বলেছি, আর আমার এমন মনে হয়েছে যে, এরফলে আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে আমার অনেক উন্নতি লাভ হয়েছে।

হৃদয় থেকে উদ্ভূত সুবহানাল্লাহ্ ছিল সেটি, শুধু বুলিসর্বস্ব নয়। একথা শুনেই সে তাচ্ছিল্যভরে বলে বসে, লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্। এর কারণ হলো, সে কখনও আন্তরিকতার সাথে সুবহানাল্লাহ্‌র বিষয় নিয়ে চিন্তাই করেনি। সারা দিন সুবহানাল্লাহ্ বলে সে কিছুই পেত না কিন্তু আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে আমি জানতাম, অনেকবার এমন হয়েছে, আমি যখন সুবহানাল্লাহ্ বলি তখন আমার এমন মনে হয়েছে যে, আমি পূর্বে ভিন্ন কিছু ছিলাম আর এখন ভিন্ন কিছু হয়ে গেছি। দেখ মহানবী (সা.)-ও এই বিষয়টি কত সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন অথচ আমি তখন পর্যন্ত বুখারী শরীফ পড়িনি কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা সঠিক ছিল। মহানবী (সা.) বলেন, "কালেমাতানে হাবীবাতানে ইলার রহমান" অর্থাৎ দু'টো শব্দ এমন আছে যা দয়ালু খোদার দৃষ্টিতে খুবই প্রিয়, "খাফিফাতানে আলাল লিসান" তা উচ্চারণ করা খুবই সহজ। মানুষ খুব সহজেই এই শব্দগুলো উচ্চারণ করতে পারে আর অনায়াসেই উচ্চারণ করতে পারে, "সাকিলাতানে ফিল মিজান"কিন্তু কিয়ামত দিবসে যখন কর্মের ওজন করা হবে তখন পাল্লায় তা অনেক ভারী প্রমাণিত হবে আর যে পাল্লায় এ দু'টো বাক্য থাকবে সেই পাল্লা সম্পূর্ণভাবে এক দিকে ঝুঁকে যাবে। সেই শব্দ দু'টো হলো "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী, সুবহানাল্লাহিল আযীম"। তিনি বলেন, আমার এই শব্দগুলো পাঠের সুগভীর অভ্যাস রয়েছে আর আমি দেখেছি অনেক সময় এই শব্দগুলো একবার উচ্চারণ করলেই আমার আত্মা ঊর্ধ্বোলোকে উড্ডীন হয়। আসল কথা হলো,আন্তরিকতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে আমাদের চিন্তা এবং প্রণিধান করা এবং সেগুলোকে কর্মে রূপায়িত করার চেষ্টা করা। এটিই সত্য কথা, অনেক সময় হৃদয়ের গভীর থেকে যখন আল্লাহ্ তা'লার তসবীহ্ করা হয়, আল্লাহ্‌র প্রশংসার গান গাওয়া হয় তখন এমন মনে হয় যেন অন্তরাত্মায় এর সুগভীর প্রভাব পড়ছে ।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সবাইকে এর তৌফিক দিন। এই তসবীহ্ যেখানে আমাদেরকে কর্মশক্তিতে বলীয়ান করবে, খোদার সন্তুষ্টি অর্জনে সহায়ক হবে সেখানে আমরা যেন এমনভাবে তসবীহ্ এবং তাহমীদ করি অর্থাৎ যেন এমনভাবে খোদার পবিত্রতার গান গাইতে পারি এবং এমনভাবে খোদার প্রশংসার গান গাইতে পারি যা আমাদের আত্মায় আধ্যাত্মিক আকাশে উড্ডয়নের শক্তি যোগাবে এবং আমরা খোদার নৈকট্য লাভ করবো।

কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক, লন্ডনের তত্ত্বাবধানে অনুদিত।

কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও কুরআন চর্চা

মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী,
প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

'আলিফ লাম মীম যালিকাল কিতাব লা রাইবা ফীহে হুদাল লিল মুত্তাকিন'

অনুবাদ: আমি আল্লাহ্ সবচেয়ে বেশী জানি। এ সেই পূর্ণাঙ্গ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। (এ হলো) মুত্তাকীদের জন্য হেদায়াত (অর্থাৎ পথ নির্দেশ)। (সূরা বাকারা-১, ২)

এটিই একমাত্র কামেল কিতাব। পরিপূর্ণ, সম্পূর্ণ কিতাব। আর এমন কোন কিতাব নাই যাকে কিতাব বলা যায়। মানবজাতির জন্য যা কিছু প্রয়োজন সবই এখানে আছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর কবিতার একটি পংক্তি;

"দিল মে মেরে ইয়েহি হ্যায় হারদাম, তেরা সাহিফা চুমু

কোরআন কে গেরদ ঘুঁমু কা'বা মেরা ইয়েহি হ্যায়"

অনুবাদ: সবসময় আমার মন চায় (হে আল্লাহ!) তোমার এই সহিফার (কিতাব) চুম্বন করি

এর আশপাশে (চক্কর কাটি) তওয়াফ করি। এটিই তো আমার কাবা (কিবলা শরীফ)

লা রাইবা ফীহে- অর্থ এই যে, এর মাঝে যা আছে সবই পুরোপুরি সত্য। এর কোথাও সামান্য ভুল-ত্রুটি-বিচ্যুতি নাই। এখানে ক্ষতিকর বা অনিষ্টের কিছু নাই। সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। সবই নিশ্চিত সত্য। নির্ভরযোগ্য বিশ্বাসযোগ্য। এতে বিশ্বাস রাখলে কেউ কখনো ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। লাভবান অবশ্যই হবে। খোদা স্বয়ং একে নাযিল করেছেন। এতে মানুষের কোন হাত নাই।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন এই কিতাব এর সাহায্যে তাকওয়া অর্জন করা যায়। খোদা পর্যন্ত পৌঁছে যাওয়া যায়। জীবন সার্থক হয়। খোদা তা'লার সাথে সাক্ষাৎ হয়। হুদাল লিল মুত্তাকীনের এটাই অর্থ।

তাকওয়া শব্দ শুনে ভয়ের কারণ নাই। এটি কোন অসম্ভব বিষয় নয়। তাকওয়া অর্থ- (ক) খোদাভীতি (খ) খোদার ভালবাসা। খোদাভীতি ও খোদার ভালবাসা-মিলিয়ে তাকওয়া।

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ মসীহ মাওউদ ও মাহদীয়ে মাওউদ (আ.) বলেছেন: "এটি সত্য কথা, আমি তোমাদের বলছি, চালাকী করে কুরআনের জ্ঞান লাভ করা যায় না। কেবল মেধাশক্তি আর বুদ্ধিমত্তা দিয়ে কুরআনের জ্ঞান লাভ হয় না। আসল শক্তি আর মাধ্যম তাকওয়া। খোদা মুত্তাকীগণের মুয়াল্লিম হয়ে থাকেন। (আল-হাকাম, ৩১ মার্চ ১৯০১)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এলহাম প্রাপ্ত হয়েছেন: 'ইন্নাল কুরআনা মুকাদ্দামুন' (মাওয়াহিবুর রহমান পৃ: ৬৯) অর্থ: নিশ্চয় কুরআন কে অগ্রাধিকার দিতে হবে। আল্লাহ বলেছেন: "তারা ঐ নূরের অনুসরণ করেছেন যা তাঁর সাথে নাযেল হয়েছে।' এখানে মহানবী (সা.) কে নূর বলা হয়েছেএবং কুরআন কে নূর বলা হয়েছে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "কুরআনের আয়াতগুলোর আড়ালে খোদার চেহারা দেখা যায়। তোমাদের মাঝে কেউ আছে যে মনোযোগ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করে? আমরা তো কুরআনে সত্যকে দেখি আর এর আয়াত সমূহে মতি আর খাঁটি কস্তুরির মত দেখি।" (কেরামাতুসসাদেকীন, পৃ:৩৩)

"যদি কুরআন না আসত তাহলে তৌহিদ থাকত না। পৃথিবী অন্ধকার হয়ে যেত। এর কারণে সকল দেশগুলো আলোকিত।" (ফার্সী পংক্তি) (বারহীনে আহমদীয়া ৩য় খন্ড, পৃ: ২০৭)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "কুরআন নিজেই দাবী করে যে, সকল প্রকার সত্য প্রকৃত সত্য এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে। সকল গুণাবলী ও ভাল কথা এখানে একত্রিত করা হয়েছে। বলা হয়েছে 'ফীহা কুতুবুন কাইয়্যেমা' (সূরা বাইয়্যেনাহ:৪) । কুরআন পৃথিবীর সকল সত্যের সমষ্টি এবং সকল ধর্মীয় কিতাবের জন্য গৌরবের কারণ। যেমন বলা হয়েছে 'ফীহা কুতুবুন কাইয়্যেমা' অর্থ: এর মাঝে সমস্ত স্থায়ী নির্দেশাবলী সন্নিবেশিত আছে।" (আল হাকাম, ১৪ নভেম্বর ১৯০০)

ওয়াততাবায়ূন নূরাল্লাযি উনযিলা মায়াহু (সূরা আরাফ:১৫৮) 'তারা ঐ নূরের অনুসরণ করেছে যা তার সাথে নাযেল হয়েছে।' আয়াতের অর্থ এই যে, সাহাবায়ে কেরাম (রা.) হযরত নবীয়ে করীম (সা.) এবং তার সাথে যে নূর নাযেল হয়েছে অর্থাৎ কুরআনের অনুসরণ করেছেন।'

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন: "যুগের অন্ধকার দূর করতে আল্লাহতালার তরফ থেকে নূর আসে। সে নূর তাঁর রসূল এবং তাঁর কিতাব। তিনি সেই নূর দিয়ে মানুষকে সত্যের পথ দেখান যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় খোদা তাদের কে অন্ধকার থেকে বের করে সত্যের পথ দেখান।" (বারাহীনে আহমদীয়া ৪র্থ খন্ড; পৃ:৫৪১)

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, 'নিশ্চয় একজন মানুষ যার পেটে বা বুকে কুরআনের কোনই অংশ নাই তার অবস্থা এমন গৃহের মত যেখানে কোন মানুষ বাস করে না।' অর্থাৎ একটি পরিত্যক্ত বাড়ী যেখানে কীটপতঙ্গ বাস করে।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, (ফার্সী নযমের পংক্তি)

"যে ব্যক্তির চোখ কুরআনের আলো থেকে আলো (নূর) সংগ্রহ করে না

আল্লাহর কসম সে আজীবন অন্ধই থেকে যাবে।

আমি সূর্যের সাথে এর (কুরআনের) তুলনা করি না।

আমি দেখছি এর চতুর্দিকে শত শত সূর্য সারিবদ্ধ হয়ে আছে" (কেরামাতুস সাদেকীন; পৃ: ১০)

"কুরআন নিজের মাঝে হাজার হাজার মোজেযা- আশ্চর্য জনক মোজেযা ধারন করে। যুগে যুগে মানুষ সেগুলো দেখতে পারে।" (সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া; পৃ:১০)

"এবং কুরআন আমাদের আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও জ্ঞান অর্জনের সম্পূর্ণ পন্থা। কুরআন এমন যে পৃথিবীর সমস্ত ঝগড়া-বিবাদের সমাধান দিতে সক্ষম...। এখানে আমাদের জীবনের জন্য অমৃতসূধা ভরে দেয়া হয়েছে।" (এযালায়ে আওহাম; পৃ:৫২৪)

"খোদা তা'লা আমাকে এজন্য পাঠিয়েছেন, আমি যেন প্রমাণ করি যে, কুরআন জীবন্ত কিতাব, ইসলাম জীবন্ত ধর্ম আর হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়াসসালাম সব সময় জীবিত রসূল।" (আল হাকাম, ৩১ মে ১৯০০)

"আমি একবার কুরআন শব্দের উপর মনোনিবেশ করলাম, আমার অন্তরে উন্মুক্ত হলো যে ,কুরআন শব্দের মাঝে একটি অবিস্মরণীয় ভবিষ্যৎবাণী রয়েছে। আর তা এই যে, কেবল কুরআনই একমাত্র কিতাব যা পড়ার মত। ভবিষ্যতে এমন দিন আসবে যখন কুরআন আরো বেশী পড়া হবে। ...ইসলামের সম্মান রক্ষার্থে মিথ্যাকে ধ্বংস করতে এটিই একমাত্র কিতাব পড়ার মত হবে। ...ফুরকান শব্দেরও অর্থ সত্য ও মিথ্যার মাঝে পার্থক্যসৃষ্টিকারী।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড; পৃ: ৩৮৬)

"কুরআন অনেক বেশী পড়া উচিত এবং কুরআন পাঠের শক্তি ও সুযোগ লাভের জন্য খোদার কাছে দোয়া করা উচিত। কারণ পরিশ্রম ব্যতীত কোন কিছু অর্জন হয় না।" (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড; পৃ: ২৩৩)

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি এলহাম করা হয়েছে, "আল খায়রো কুল্লুহু ফীল কুরআন, কিতাবুর রহমান।" (বারাহীনে আহমদীয়া, ৪র্থ খণ্ড; প: ৫৫৪)

"তোমাদের জন্য কুরআনের শিক্ষা অত্যন্ত জরুরী। কুরআন কে পরিত্যক্ত জিনিসের মত রেখে দিও না। এরই মধ্যে তোমাদের জীবন। যারা কুরআনকে সম্মান দিবে তারা আকাশে সম্মান লাভ করবে।" (আমাদের শিক্ষা)

আমরা সবাই মো'জেযা দেখতে আগ্রহ রাখি। কিন্তু এদিকে দেখি না যে, কুরআন কতবড় মো'জেযা। এর চেয়ে বড় মো'জেযা হয়না। কখনো এর চেয়ে বড় মো'জেযা আর হবে না। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "ইলমি মো'জেযাই (জ্ঞান ভিত্তিক) বড় মো'জেযা। হযরত নবী করিম (সা.) এর সবচেয়ে বড় মো'জেযা তো ছিল কুরআন যা আজ পর্যন্ত চলমান।" (আল হাকাম, ২৪ জানুয়ারি ১৯০১)

হুযূর (আ.) আরো বলেছেন, "কুরআনের মো'জেযা চিরস্থায়ী মো'জেযা। এ সম্পর্কে (মানুষের) জ্ঞানের অভাব। নয়তো যদি পড়ানোর, বোঝানোর মত কেউ থাকে তাহলে আজও বোঝা সম্ভব।" (আল হাকাম, ১৭ই নভেম্বর ১৯০২)

আমি আপনাদের বলতে চাই, আপনারা বিশ্বাস রাখুন কুরআন সবসময় আপনাদের পথ দেখাবে। অলৌকিক ভাবেও পথ দেখাবে যদি আপনারা মনোনিবেশ করেন।

তিনি (আ.) বলেছেন, "কোন মানুষ এমন নাই যে কুরআন পড়ে আর তার অন্তরে ভয় সৃষ্টি হয় না।" (আরিয়া ধরম; পৃ: ৪০)

তিনি (আ.) বলেছেন, "কুরআন একটি পরিপূর্ণ মো'জেযা। জীবন্ত মো'জেযা এবং কালাম এরকম মো'জেযা কখনো পুরানো হতে পারে না।" (আল হাকাম, ২৪ এপ্রিল ১৯০৩)

"খোদা তা'লা যুগে যুগে বিভিন্ন জাতির মানুষকে বিধান দিয়েছেন। তারপর তিনি ইচ্ছা করেছেন যে, যেমন এক খোদা তেমনি সকলে এক হয়ে যাক। তাই সবাই কে এক করতে কুরআন নাযেল করেছেন। আর খবর দিয়েছেন, এমন একদিন আসছে যখন সকল জাতিগুলোকে একত্রিত করে এক বানিয়ে দিবেন। সকল দেশগুলো একত্রিত হয়ে যাবে। সকল ভাষা এক হয়ে যাবে।" (নাসিমে দাওয়াত;পৃ:৬১) অর্থাৎ সবাই কুরআন পড়বে। আরবী ভাষা শিখবে।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এসেছেন সারা দুনিয়ার মানুষের কাছে কুরআনের বাণী পৌঁছে দেবার জন্য। তিনি একদিন খুব চিন্তা করছিলেন, ভারাক্রান্ত মনে ভাবছিলেন; কিভাবে এ কাজ হবে। এমন সময় তার দৃষ্টি এই আয়াতের প্রতি নিবদ্ধ হলো: এবং এটি এমন এক অতীব বরকতপূর্ণ কিতাব যা আমরা নাযেল করেছি, যা এর পূর্ববর্তীর (বাণীর) সত্যায়নকারী কারী, আর যেন তুমি এর দ্বারা জনপদের জননী (মক্কাবাসী) কে এবং যারা এর চতুর্পাশে আছে তাদের তুমি সতর্ক কর।..." (সূরা আনামের ৯৩ নং আয়াতের প্রথম অংশ)

হুযূর (আ.) লিখেছেন, খোদা আমাকে খুব নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস ও জ্ঞান দান করেছেন, (ক) কুরআন উম্মুল কিতাব পূর্বের সকল ঐশীগ্রন্থ সমূহের মা, (খ) আরবী ভাষা সকল ভাষা সমূহের মা। সকল ভাষা গুলো আরবী থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অন্যভাষা সমূহ এর পুত্র বা কন্যা সন্তানের মত। গৃহের দাস-দাসীর মত। সবাই এখানে খাচ্ছে। সবাই এই নদী থেকে পিপাসা মিটাচ্ছে। সব ভাষা গুলো আরবী ভাষা থেকে পোশাক বানাচ্ছে। আরবী উম্মুল আলসেনা (সকল ভাষার মা)। এর বিরুদ্ধে কারো মতবিরোধ থাকা উচিৎ না। (মেনানুর রহমান; পৃ:৩৭-৪২। সারাংশ খাকসারের ভাষায়)

অর্থাৎ মক্কা মুকাররামা পৃথিবীর সকল জনপদের জননী। আর আরবী সকল ভাষার মা। খাতামুল কুতুব। এর অর্থ এই যে, একদিন আসবে যখন সকল জাতির জনপদের মানুষ, সকল অঞ্চলের সারা দুনিয়ার মানুষ জানবে যে, তাদের মা মক্কা। সকলের কা'বা-কিবলা মক্কা মুকাররমা। সকলের জন্য মক্কা মুকাররমা বারবার ফিরে আসার স্থান। অতএব সবাই আরবী ভাষা এবং কুরআন পড়বে। আল্লাহ্‌র ইবাদত করবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উপর ঈমান আনবে। তথা সারা বিশ্বের মানুষ ইসলাম কবুল করবে, মুসলমান হবে। এতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) খুব খুশি হলেন যে, আহমদী জামাতের চেষ্টা সফল হবে, সবাই মুসলমান হবে। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-কে আল্লাহ্‌র রসূল মেনে কলেমা পড়বে- লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ।

কুরআন তেলাওয়াতের গুরুত্বের কথা বললাম। হযরত (আ.) এ ব্যপারে এত বেশী লিখেছেন যে সবগুলো লিখলে একখানা কিতাব হবে।

এবার আমি কুরআন চর্চার কয়েকটি কথা

উল্লেখ করতে চেষ্টা করছি। আশা করি আপনারা লাভবান হবেন।

কুরআন চর্চা সম্পর্কে প্রথম কথা: "বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহীম" আল্লাহ্‌র নামে যিনি অযাচিত অসীম দাতা, পরম দয়াময়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য আল্লাহর রহমত লাভ করা কত সহজ করেছেন। কুরআনের প্রথম আয়াত বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম তার প্রমাণ। এটি এমন আয়াত যা একশ চৌদ্দ বার কুরআনে লেখা হয়েছে। হযরত মুহাম্মদ (সা.) স্ব-ইচ্ছায় একশ চৌদ্দবার লেখেননি; আল্লাহর আদেশেই লিখেছেন। আমরা বিশ্বাস করি এতবারই নাযেল হয়েছে এবং লেখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আমাদের ভেবে দেখা দরকার যে, এ আয়াত এতবার কেন নাযেল করেছেন।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক কাজের আরম্ভে তোমরা বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম পড়ে কাজ আরম্ভ করবে। তোমরা আল্লাহর রহমত লাভ করবে।

পৃথিবীতে হয়ত এমন কোন একজন মুসলমানও পাওয়া যাবে না যে এ আয়াত পড়তে জানে না। এটি আল্লাহর অনেক বড় দয়া, অনেক বড় করুণা যে, তিনি এ আয়াত এতবার নাযেল করেছেন যেন আমরা কখনো কোন কাজের আরম্ভে এ আয়াত পড়তে ভুল না করি। এ আয়াতে কী আছে? এ আয়াতে আল্লাহর প্রধানতম দুটি (সেফাত) গুণাবলীর উল্লেখ আছে।

তিনি (আ.) বলেছেন, "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম সমগ্র কুরআনের সারাংশ" (আল হাকাম, ১৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯০১)।

ঘটনা এই যে, 'আল্লাহ'- আল্লাহর আসল নাম। বাকী সমস্ত নামগুলো গুণবাচক নাম। আল্লাহর নিজের প্রধানতম গুণবাচক নাম রহমান-রাহিম বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিমে রেখেছেন। তাইতো এ আয়াতের মহিমা এত বেশী।

আমি অতি সহজভাবে বোঝাবার জন্য বলছি যে, রাব্বুল আলামীন অর্থ- 'মা'। আর রহমান-রাহিম মায়ের দুধ। রাব্বুল আলামীন এর কাছ থেকে আমরা সুস্থ সবল শরীর, অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ লাভ করি। রহমান আমাদের কে হেদায়াত দান করেন। রহমানের দেয়া হেদায়াত মেনে চললে তথা সৎকর্মশীল হলে আমরা রাহিমের কাছ থেকে পুরস্কার লাভ করি। রহিমের দয়ার ফলে আমাদের পুণ্যকর্মের মাঝে যেসব দূর্বলতা থেকে যায় তারপরেও সওয়াব বা পুরস্কার লাভ করি। আল্লাহর অনুগ্রহ লাভ করি।

রহমানের তাজাল্লী বা বিকাশের ফলে আল্লাহ মানুষের সাথে কথা বলেন। আল্লাহর বাণী নাযেল হয়। নবীগণ নবুয়্যাত লাভ করেন। রহমানের তাজাল্লী বা বিকাশের ফলে শরীয়তের কিতাব নাযেল হয়। রহমানের মহা বিকাশের ফলে হযরত মুহাম্মদ মুহাম্মদ হন। সাল্লাল্লাহে আলাইহে ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ তার প্রশংসা করেন। মুহাম্মদ (সা.) এর মাধ্যমে আল্লাহর মহিমা আল্লাহর হামদ বা প্রশংসা করা হয়। হযরত মুহাম্মদ (সা.) দ্বারা সঠিক অর্থে পূর্ণ মাত্রায় আল্লাহর হামদ প্রকাশিত হয়েছে।

রহীমের তাজাল্লীতে মানুষের পূণ্য কর্ম আল্লাহর দরবারে কবুলিয়্যত বা গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.) এর মত মানুষ আল্লাহ ও তাঁর রসূল মুহাম্মদ (সা.) প্রেমে বিভোর হয়ে, মুহাম্মদ (সা.) এর পরিপূর্ণ আনুগত্য করেন। মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্য করতে গিয়ে নিজেকে নিঃশেষ করে দেন এবং 'আহমদ' এর মাকাম বা মর্যাদা লাভ করেন। আহমদ তিনি যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর রং এ রঙ্গীন হয়েছেন। আহমদ তিনি যিনি মুহাম্মদ (সা.) এর নূরে নূরান্বিত হয়েছেন, তাঁর আলোয় আলোকিত হয়েছেন। তাই তিনি আহমদ (আ.)। মুহাম্মদ (সা.) মূলত আল্লাহর নূরে নূরান্বিত। আর আহমদ (আ.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যের মাধ্যমে ঐ নূর লাভ করেছেন। হযরত মুহাম্মদ -শিরাজুম মুনীরা, রুহানী জগতের সূর্য আর আহমদ (আ.) রূহানী জগতের চাঁদ।

অতএব বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম অত্যন্ত আধ্যাত্মিক কল্যাণভরা একটি কালেমা বা বাণী পাঠ করে সীমাহীন বরকত ও রহমান বা কল্যাণ ও কৃপা লাভ করতে পারি।

কুরআন চর্চার দ্বিতীয় উদাহরণ সূরা ফাতিহা। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেছেন, সূরা ফাতিহা তো অনেক বড় মোজে'যা। কুরআনের সারাংশ। প্রত্যেক নামাযে প্রতি রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়তে হয়। সূরা ফাতেহা ব্যতীত কোন নামায, কোন দোয়া হয় না। সূরা ফাতেহার এরকম তফসীর কেউ লিখতে পারেননি যেমন হযরত আহমদ (আ.) লিখেছেন। আল্লাহর তরফ থেকে জ্ঞান লাভ করে হুযুর (আ.) সূরা ফাতেহার তফসীর লিখেছেন। প্রায় ৩৫০ পৃষ্ঠার তফসীর। সূরা ফাতেহা পড়ে কোন মূমুর্ষ রোগীর উপর ফুঁ দিলে রোগী আরোগ্য লাভ করে। এত বেশী শক্তিশালী সূরা পড়তে আমাদের জন্য সুযোগ করে দেয়া হয়েছে প্রত্যেক নামাযে। যদি নামাযে প্রত্যেক রাকাতে সূরা ফাতেহা পাঠ করা ফরয না হোত তাহলে আমরা সূরা ফাতেহা পড়ার সুযোগ অনেক কম পেতাম এবং অনেক কম উপকৃত হতাম।

আমরা যদি নামাযে মনোযোগ দিয়ে সূরা ফাতেহা পাঠ করি তাহলে অনেক রহমত ও কল্যাণ বা কৃপা লাভ করতে পারি। যদি অনুবাদ না শিখে বা না জেনে সূরা ফাতেহা মনোযোগ না দিয়ে পাঠ করি তাহলে আমরা বড় ভুল করব। অবশ্যই সূরা ফাতেহা এবং নামাযে যা কিছু পাঠ করি তার অনুবাদ শিখে নেয়া আবশ্যক। আল্লাহ আমাদের শক্তি দান করান যেন মনোযোগ দিয়ে নামায আদায় করতে পারি। সাহাবায়ে কেরামের যুগে কুরআন লিখিত আকারে ছিল না। তারা সবাই নামাযে সূরা সমূহ মুখস্ত পাঠ করতেন। সেটি ছিল কুরআন তেলাওয়াত।

আমাদের হাতে ছাপানো বই আকারে কুরআন আছে। আমরা খুব কম সূরা মুখস্ত করি। অতএব নামায ফজরের আগে ও পরে আমাদের কুরআন তেলাওয়াত করা খুবই জরুরী। নয়ত আমরা আল্লাহর রহমত লাভে ব্যর্থ হব।

প্রতিদিন ২/৪ পাতা বাংলা কুরআন অনুবাদ সহ পড়ুন। আমাদের কুরআনের বাংলা অনুবাদটি অনেক মূল্যবান। এখানে টীকা আকারে তফসীরের অনেক গুরুত্বপূর্ণ অংশ দেয়া হয়েছে। প্রতিদিন আমরা যদি এক পাতার এপিঠ ওপিঠ তরজমা সহ পাঠ করি তাহলে তিন বছরে একবার পুরো কুরআন পাঠ হবে। এভাবে জীবনে বহুবার কুরআন পাঠ হবে। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, "কোন মানুষ নাই যে কুরআন পড়ে আর তার অন্তরে ভয় সৃষ্টি না হয়।" (আরীয়া ধরম; পৃ:৪০)

প্রতিদিন সকালে কুরআন তেলাওয়াত করলে সারাদিন এর কল্যাণে আমরা আল্লাহর অনেক সাহায্য পাব এবং পাপ কম হবে। ইনশাআল্লাহ!

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এর উর্দূ কবিতা বা দূররে সামীনের একটি পংতি:

জামাল ও হুসনে কুরআন নূরে জানে হার
মুসলমাঁ হ্যায়
কামার হ্যায় চান্দ আওরোঁ কা হামারা চান্দ
কুরআন হ্যায়।

অনুবাদ: কুরআনের সৌন্দর্য্য ও গুণাবলী
প্রত্যেক মুসলমানের প্রাণের নূর
অন্যদের চাঁদ আকাশের চাঁদ আমাদের চাঁদ
কুরআন

(হযরত মসীহ মাওউদ (আ.), দূররে সামীন)

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী সত্যকথা এই যে, কেউ যদি অন্তরে আল্লাহর ভালবাসা, রসূলের (সা.) এর ভালবাসা রাখে তাহলে সে যখন কুরআন তেলাওয়াত করে মনমগ্ন হয়ে, তাহলে অনেক সময় তার প্রতি আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ বা ফযল নাযেল হয়।

এখানে বিশেষভাবে আমি আপনাদের বলতে চাই যে, আত্মবিশ্বাস একান্ত আবশ্যক। আপনি বা আমি কেন বিশ্বাস করব না যে আমি আল্লাহর প্রিয় বান্দা, আহমদী মুসলমান! যদি এমন আত্মবিশ্বাস দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে পারি তাহলে অবশ্যই কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহর বিশেষ নিদর্শন লাভ করতে পারি।

এখানে আবার স্মরণ করাতে চাই যে, তওহীদ (আল্লাহ এক) এর অর্থ এই যে, কোন মানুষ তুচ্ছ বা আল্লাহর চোখে, অবহেলিত নয়। যে আশা নিয়ে বিশ্বাস নিয়ে আল্লাহর কাছে চায়, সে অবশ্যই আল্লাহকে কাছে পাবে। তেলাওয়াতের মাধ্যমে দোয়া কবুলের নিদর্শন পেতে পারে।

এই সংক্ষিপ্ত সময়ে একটি মাত্র উদাহরণ দিতে চাই, যদিও বহু উদাহরণ দিতে পারি। হযরত মাওলানা জালাল উদ্দিন শামস (রা.) ১৯২৮-৩২ সনে ফিলিস্তিন জামাতের মোবাল্লেগ ছিলেন। তিনি একজন ফিলিস্তিনী আহমদীর ঘটনা আমাদের দৈনিক আল-ফযল পত্রিকায় লিখেছিলেন। ঐ ফিলিস্তিনী আহমদী ভাইয়ের ছয়জন কন্যা সন্তান ছিল। কোন পুত্র সন্তান ছিল না। একদিন ভোরে তিনি নিয়মিত তেলাওয়াত করছিলেন। যখন সূরা নূহ্ এর আয়াত নং: ১১-১২ 'আমি তাদের বলেছি, তোমরা এস্তেগফার কর, আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাও নিশ্চয় তিনি অতীব ক্ষমাশীল; তিনি তোমাদের জন্য মুষলধারে বর্ষনশীল মেঘ পাঠাবেন। এবং ধনসম্পদ, সন্তান দিয়ে তোমাদের সাহায্য করবেন...' (সূরা নূহ: ১১-১৩) তেলাওয়াত করছিলেন; এমন সময় আল্লাহ তাঁর অন্তরে বিশ্বাস সৃষ্টি করলেন যে, তুমি যদি অনেক বেশী-এস্তেগফার কর প্রতিদিন তাহলে তোমার পুত্র সন্তান লাভ হবে। এরপর ঐ ভাই অনেক এস্তেগফার পড়তে শুরু করলেন। ফলে তার গৃহে পুত্র সন্তানের জন্ম হলো। আমার যতদূর স্মরণ আছে খুব সম্ভব ছয়জন পুত্র সন্তানের জন্ম হয়েছিল তার গৃহে।

এস্তেগফারের বিষয়ে বিস্তারিত জানা দরকার। পৃথক প্রবন্ধ হতে পারে এস্তেগফারের উপকার অনেক অনেক অনেক বেশী। যেমন পুত্র সন্তান লাভ, দারিদ্র বা অভাব দূর হওয়া ইত্যদি।

আমরা প্রত্যেকেই কুরআনের কল্যাণ লাভ করতে পারি। তিনি (আ.) লিখেছেন: "তোমাদের জন্য সুসংবাদ এই যে, খোদার নৈকট্য লাভের ময়দান শূন্য। প্রত্যেক জাতি সংসার প্রেমে মত্ত। আর যে কথায় খোদা সন্তুষ্ট হন সেদিকে দৃষ্টি নাই।" (আল-ওসীয়্যত পৃ:১১)

অর্থাৎ কেউ আল্লাহর নৈকট্য পেতে চায় না। এটি একটি যুগান্তকারী ঘোষনা যে, খোদার নৈকট্য লাভ করতে চাইলেই তা লাভ করা সম্ভব। আল্লাহর নিকটে যেতে রাস্তায় কোন দারোয়ান পথ আটকাবে না।

সবশেষে যা বলতে চাই তা এই যে, হযরত রাসূল (সা.) বলেছেন, "যখন কারো সাথে তোমার সাক্ষাৎ হয় তখন তাকে আসসালামো আলাইকুম বল। চেনা বা অচেনা, ছোট-বড় সবাইকে দেখা হলে সালাম বল।" সালামের অর্থ কী? 'তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক'। অর্থাৎ আমার হাতে, আমার কাছে আপনি নিরাপদ। আমাকে আপনি ভয় পাবেন না। আমার কাছে আপনি যেই হোন, আপনি নিরাপদ। আপনার কোন ক্ষতি আমি করতে পারি না। কারন আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসারী। হুযুর (সা.) এর ধর্ম ইসলাম। এখানে কারো ক্ষতি করা নিষেধ। অপরজন বলবেন, ওয়ালাইকুম আসসালাম অর্থাৎ আমার কাছেও আপনি নিরাপদ। আমি আপনার কোন ক্ষতি করব না।

দেখুন; সালামের অর্থ কী! যারা একে অপরকে সালাম বলে তারা মুসলমান, তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাম বা নিরাপত্তা লাভ করে।

জান্নাতীদের সম্পর্কে কুরআনের সূরা ইব্রাহীম-এর ২৪ নং আয়াতে বলা হয়েছে- অনুবাদ: জান্নাতীরা একে অপরকে সালামের উপহার বিনিময় করবেন। তফসীর এই যে, যাদের অন্তরে কারো বিরুদ্ধে কোন দূরভিসন্ধি নাই; যারা পরিষ্কার অন্তরে পবিত্র মনে একে অপরকে সালাম বলে তারা ইহজীবনে জান্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি করে।

জাহান্নাম কী? জাহান্নাম- হিংসা-বিদ্বেষ, হানা-হানী, অন্তর জ্বালা । যারা অন্তরে কারো প্রতি হিংসা বিদ্বেষ রাখে না তাদের অন্তরে কোন জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না।

"Love For All Hatred For None"- হযরত মির্যা নাসের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) এ মোটো দিয়ে গেছেন। আজ সারা পৃথিবীর সকল দেশে, সকল জলসায় এই স্লোগান দেয়া হয়। আমরা দেখেছি, বিদেশের জলসায় অনেক অমুসলিমও বলেছেন, Love For All Hatred For None- তারা এর উচ্ছসিত প্রশংসা করেছেন। অনেক অমুসলিমরা আহমদীয়াতের নাম জানেন না। তারা জানেন যে, এরা Love For All -এর দল।

বিদেশে অমুসলিমদের কাছে আহমদীরা পরিচিতি এভাবেই লাভ করেছেন। সেখানে আমরা কি আন্তরিকতার সাথে একে অপরকে আসসালামো আলাইকুম বলব না?

আমরা যারা হযরত রসূলে করীম (সা.) এর সুন্নত এবং উপদেশ পালন করি, যখনই কারো সাথে দেখা হয় আসসালামো আলাইকুম বলি তারা এখানে জান্নাতের পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা করি।

আমরা কেন জান্নাতের আশা করব না? আমরা মুসলমান। আমরা রসূলে করীম (সা.) এর উম্মত তারপর হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-কে হুযুর (সা.) এর নির্দেশে মান্য করেছি। আমরা অবশ্যই জান্নাতের আশা রেখে বিশ্বাস রেখে আল্লাহর ইবাদত করি। আহমদীরা যারা রসূলুল্লাহ (সা.) এর সুন্নতের উপর আমল করতে চেষ্টা করি তারা জান্নাতের আশা করতে পারি।

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) একজন বুযূর্গ সাহাবী হযরত শেখ মুহেবুর রহমান কপূর্থলবী আমাকে একটি দোয়া শিখিয়েছিলেন। অনেক সময় এ দোয়া করতে চেষ্টা করি। আপনাদের কে জানাতে চাই। তিনি বলেছিলেন, দোয়া কর, হে আল্লাহ! আমি অনেক বড় পাপী। আমার পাপ গুনে শেষ করা যাবে না। আমার তেমন কোন নেকী নাই [হয়ত আমার নেকী কবুল হয় কিনা জানি না।] কিন্তু, একটি নেকী তো আছে। একটি নেকী অবশ্যই আছে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল করবে এবং আমার সব পাপ ক্ষমা করবে এবং আমার সব পাপ ক্ষমা করবে। ঐ নেকী এই যে, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি মুসলমান অবশ্যই আমি হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর উম্মত এবং আমি হযরত মসীহ মাওউদ ইমাম মাহদী (আ.) কে মান্য করেছি। তাই আমাকে কাফের বলে গাল দেয়, মন্দ বলে খারাপ চোখে দেখে এজন্য আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

আমাদের প্রত্যেকের দৃঢ় বিশ্বাস ও দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে দোয়ারত থাকা উচিত, আল্লাহতালা আমাদের দোয়া কবুল করবেন।

অবশেষে আলহামদুলিল্লাহিরাব্বিল আলামীন।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর মহান কার্যাবলীর এক ঝলক

মাহমুদ আহমদ সুমন

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ হযরত মির্যা বশির উদ্দিন মাহমুদ আহমদ (রা.) ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারি কাদিয়ানে জন্মগ্রহণ করেন।

হুযূর (রা.) ১৯১৪ সনের ১৪ই মার্চ খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯০৬ সনের ডিসেম্বর মাসে মাত্র সতের বছর বয়সে সর্বপ্রথম কাদিয়ানে সালানা জলসায় বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল **'শিরকের মুলোৎপাটন'**। হুযূর (রা.) ধর্মীয় সম্মেলন উপলক্ষ্যে ১৯২৪ সনে ইসলামের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করার জন্য প্রথম লন্ডনে যান। এ উপলক্ষ্যে তিনি আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলাম (Ahmadiyya or true Islam) এ শিরোনামে প্রবন্ধ পাঠ করেন, যা পরে পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটি পাঠ করেন স্যার মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব (রা.)।

মহান ঐতিহাসিক ভবিষ্যদ্বাণী ঃ

হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) বলেন, "পরম কারুনিক পরমদাতা মহিমান্বিত খোদা যিনি সর্ব শক্তিমান" যার মর্যাদা মহাগৌরবময় এবং নাম অতীব মহান, আপন ইলহাম দ্বারা সম্বোধন পূর্বক বলেন ঃ "আমি তোমাকে এক করুণার নিদর্শন দিতেছি। তুমি যেভাবে আমার নিকট চেয়েছো তদনুযায়ী আমি তোমার সকরুণ নিবেদনসমূহ শুনেছি এবং তোমার দোয়াসমূহকে করুণা সহকারে কবুল করেছি এবং তোমার সফরকে (হুশিয়ারপুর ও লুধিয়ানায়) তোমার জন্য কল্যাণময় করেছি! সুতরাং শক্তির, দয়ার এবং নৈকট্যের নিদর্শন তোমাকে দেওয়া হয়েছে। বিজয়ের চাবি তুমি প্রাপ্ত হচ্ছো।

ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত মুসলেহ মাওউদ -এর অসাধারণ গুণাবলী ও কার্যাবলী ঃ

"সুতরাং তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর, এক সুদর্শন এবং পবিত্র সন্তান তোমাকে দেয়া হবে। এক মেধাবী পুত্র তুমি লাভ করবে। সেই পুত্র তোমারই সন্তান হবে। সুশ্রী, পবিত্র পুত্র তোমার মেহমান আসতেছে। তার নাম আনুমুয়ায়েল এবং সুসংবাদ দাতাও বটে...। তার সঙ্গে ফযল (বিশেষ কৃপা) আছে, যা তার আগমনের সাথে উপস্থিত হবে। সে জাঁক-জমক, ঐশ্বর্য ও গৌরবের অধিকারী হবে। সে পৃথিবীতে আসবে এবং তার সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যাধিমুক্ত করবে। সে কালেমাতুল্লাহ্-আল্লাহর বাণী। কারণ খোদার দয়া সূক্ষ্ম মর্যাদাবোধ তাকে সম্মানিত বাক্য দ্বারা প্রেরণ করেছেন। সে অত্যন্ত ধীমান, প্রজ্ঞাশীল, হৃদয়বান এবং গাম্ভীর্যশীল হবে। জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাকে পরিপূর্ণ করা হবে। সে তিনকে চার করবে (এর অর্থ বুঝি নাই)। সোমবার শুভ সোমবার। সম্মানিত মহৎ, প্রিয়পুত্র।

"মাযহারুল হাক্কে ওয়াল উলা কায়ান্নাল্লাহা নাযালা মিনাস্ সামায়ে" অর্থাৎ সত্যের বিকাশস্থল ও সুউচ্চ যেন আল্লাহ আকাশ হতে অবতীর্ণ হয়েছেন। তার আগমন অশেষ কল্যাণময় হবে এবং ঐশী গৌরব ও প্রতাপ প্রকাশের কারণ হবে। জ্যোতিঃ আসছে জ্যোতিঃ খোদা তাকে তার সৌরভ নির্যাস দ্বারা সিক্ত করেছেন। আমরা তার মধ্যে আপন রূহ ফুঁৎকার করে দিব এবং খোদার ছায়া তার শিরে থাকবে। সে শীঘ্র বৃদ্ধি লাভ করবে এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হইবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে। তখন তার আত্মিক কেন্দ্র আকাশের দিকে উত্তোলিত হবে। ওয়া কানা আমরাম্মাকযিয়া (অর্থাৎ এটাই আল্লাহর অটল মীমাংসা)। (ইশতেহার ২০শে ফেব্রুয়ারী)

অতঃপর ১৮৮৬ সালের ২২শে মার্চ আর একটি বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) এ-ও ঘোষণা করেন যে, উল্লিখিত ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী অসাধারণ গুণসম্পন্ন মহান পুত্র নয় বছরের মধ্যে অবশ্যই জন্ম লাভ করবেন। এরপর এই নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই তৃতীয় বছর অর্থাৎ ১৮৮৯ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে 'শুভ সোমবার' প্রতিশ্রুত পুত্র জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর পবিত্র নাম ১৮৮৮ সালের ১লা ডিসেম্বরের ইশতেহারে প্রকাশিত ইলহাম অনুযায়ী বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ রাখা হয়। তার জন্মের পূর্বে এবং জন্মের পরও হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) ইলহাম মারফত অবগত হয়ে নির্দিষ্টভাবে তাঁর সম্বন্ধে এটি প্রকাশ করেন যে, মুসলেহ মাওউদ (প্রতিশ্রুত সংস্কারক পুত্র) তিনিই।

১৯৪৪ ইং সনের ৪-৫ জানুয়ারী মধ্যবর্তী

রাতে লাহোরস্থ মোকাররম শেখ বশীর আহমদ সাহেবের বাসায় রাত্রি যাপন কালে এই প্রতিশ্রুত পুত্র হযরত মির্যা বশির উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, যিনি তখন আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের দ্বিতীয় খিলাফতে আসীন, এক মহান রুইয়ার মাধ্যমে জানতে পারেন যে, তিনিই মুসলেহ মাওউদ। পরবর্তীতে ২৮শে জানুয়ারীতে কাদিয়ানের মসজিদে জুমুআর খুতবায় এবং ২০শে ফেব্রুয়ারী তারিখে হুশিয়ারপুর শহরে জলসা করে মুসলেহ মাওউদ হওয়ার দাবীর জোরদার ঘোষণা করেন। দিল্লী শহরেও সাধারণ মিটিং করে অনুরূপ ঘোষণা দেন।

মুসলেহ মাওউদ (রা.) সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে তাঁর যে সকল গুণাবলী ও কার্যাবলী উল্লেখিত হয়েছে পরবর্তীতে তাঁর খিলাফত কালে সেগুলো শক্তিশালীভাবে পূর্ণ হতে দেখা যায়। তাঁর এ সুদীর্ঘ খিলাফতকালে প্রতিটি আগত দিন জামা'তের জন্য কোননা কোন উন্নতি ও আশার বাণী নিয়ে আসত।

প্রকাশনা জগতে অবদান ঃ

হযরত মুসলেহ্ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে যে, "জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানে তাঁকে পরিপূর্ণ করা হবে।" তাঁর জীবদ্দশায় অমূল্য কুরআনের তফসীর গ্রন্থ ও বহু পুস্তক পুস্তিকা রচনার মাধ্যমে ইসলামের মহান সেবার দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখিত বাক্যাবলী পূর্ণতা লাভ করেছে। ১৯০৬ সনে মাত্র ১৭ বছর বয়সে 'তাশহিযুল আযহান' নামক একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রিকায় তিনি নিজে সম্পাদক হন। ১৯১৩ সালে সাপ্তাহিক আল ফযল প্রকাশ করেন। ১৯১৬ সনে কুরআনের প্রথম পারা উর্দু ও ইংরেজীতে প্রকাশ করেন। সুবিখ্যাত তফসীরে কবীরসহ শত শত পুস্তক-পুস্তিকা এবং অনেক খুতবা, বক্তৃতা, ভাষণ প্রকাশিত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) শুধু মাত্র কুরআনের তফসীর গ্রন্থ 'তফসীরে কবীর' ও 'তফসীরে সগীর' রচনা করে ইসলামের সেবায় যে অসামান্য অবদান রেখেছেন, তা-ই তাকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজে ঘোষণা করেছেন, আমাকে খোদা তাআলা স্বয়ং কুরআনের জ্ঞান দান করেছেন আর আমি ব্যতিত দুনিয়াতে আর কাউকেই খোদা তাআলা কুরআনের জ্ঞান দান করেন নি। আর আমি সমস্ত দুনিয়াকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করছি, কুরআনের তত্ত্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা বর্ণনায় কেউ আমার মোকাবেলা করুক। কুরআনের তফসীর ছাড়াও তার উল্লেখযোগ্য কিছু পুস্তক হচ্ছে ঃ ১। যিকরে ইলাহী ২। ইরফানে ইলাহী ৩। তকদীরে বিল্লাহ ৪। নবীওঁকা সরদার ৫। মালায়েকাতুল্লাহ্ ৬। নাজাত ৭। মিনহাজুত তালেবীন ৮। দুনিয়াকা মুহসীন, ৯। ওহঃৎড়ফঁপঃরড়হ ঃড় ঃযব ংঃফু ড়ভ ঃযব ঐড়ষু ছঁৎধহ ১০। অযসধফ ঃযব সবংংধহমবৎ ড়ভ ঃযব ষধঃঃবৎ ফধুং ১১। ওহারঃধঃরড়হ ঃড় অযসধফরুধঃ ১২। যিধঃ রং অযসধফরুধঃ? ১৩। এঁযব হবা ডড়ৎষফ ড়ৎফবৎ ড়ভ ওংষধস.

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ১৯১৪ সনে মাত্র পঁচিশ বৎসর বয়সে খিলাফতে আসীন হয়ে বহির্বিশ্বে ইসলাম প্রচারক প্রেরণ করতে থাকেন। হযরত মসীহ মাওউদ (রা.)-এর উপর অবতীর্ণ একটি ভবিষ্যদ্বাণী ছিল "ম্যায় তেরে তবলীগকো দুনিয়াকে কিনারো তক পহচাউঙ্গা" অর্থাৎ আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব। এই মহান ভবিষ্যদ্বাণীটি মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর যুগান্তকারী পদক্ষেপ সমূহের মাধ্যমে পূর্ণতা লাভ করে। এক এক করে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করতে থাকেন। আজ আমরা সেই বীজগুলোকে বিশাল বিশাল বৃক্ষরূপে দেখছি।

১৯৫১ ইং সনে তিনি কাযী আব্দুল্লাহ সাহেবকে মোবাল্লেগ হিসেবে লন্ডন প্রেরণ করেন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে চৌধুরী ফতেহ মুহাম্মদ সাদেক এবং আব্দুর রহীম নাইয়ার সাহেব যথাক্রমে যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম আফ্রিকার মিশনারী হিসাবে প্রেরিত হন। ১৯২০ খৃষ্টাব্দে মৌলভী মোবারক আলী (বাঙ্গালী) এবং মালিক গোলাম ফরিদকে বার্লিনে প্রেরণ করেন। ১৯২৪ খৃষ্টাব্দের ১৯শে অক্টোবর খলীফাতুল মসীহ সানী ও মুসলেহ মাওউদ (রা.) লন্ডন মসজিদের ভিত্তি স্থাপন করেন। ১৯৩৪-৩৮ সনের মধ্যে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) পোল্যান্ড, হাঙ্গেরী, যুগোস্লাভিয়া, ইতালি এবং আলবেনিয়ায় মিশন স্থাপন করেন। এভাবে ক্রমান্বয়ে পৃথিবীর প্রায় সকল গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রগুলোতে তিনি মোবাল্লেগ প্রেরণ করেন আর সারা বিশ্বে আহমদীয়াতের প্রচারের দরজা খুলে যায়।

১৯১৩ ইং সালের জুলাই মাসে হযরত চৌধুরী ফতেহ মোহাম্মদ সাইয়্যাল সাহেবকে প্রথম মুবাল্লেগ হিসেবে ইংল্যান্ডে পাঠান। সেপ্টেম্বর ১৯১২ ইং সনে হযরত খাজা কামাল উদ্দীন উকিল সাহেব নিজ ব্যবস্থায় লন্ডন যান। যদিও তিনি নিজ উদ্যোগে গিয়েছিলেন তবুও প্রথম-প্রথম জামা'তের প্রতিনিধি মনে করা হয়েছে। পরে তার কর্মকান্ডের ও বক্তব্যের কারণে তারপর দ্বিতীয় খলীফার হাতে বয়াত না করার ফলে জামা'তের সাথে তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। তাছাড়া ১৯১৪ ইং সনে তিনি দেশে ফেরত এসে মৌলভী মোহাম্মদ আলীর দলে শামীল হন।

মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ রয়েছে "সে পৃথিবীতে আসবে এবং তাঁর সঞ্জীবনী শক্তি এবং পবিত্র আত্মার প্রসাদে বহুজনকে ব্যধিমুক্ত করিবে।" এছাড়া আরও উল্লেখ আছে, "সে বৃদ্ধি লাভ করবে। এবং বন্দীদের মুক্তির উপায়স্বরূপ হবে এবং পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে প্রসিদ্ধি লাভ করবে। জাতিগণ তার কাছ থেকে আশিস লাভ করবে।"

১৯১৫ ইং সনের ৪ সেপ্টেম্বর হযরত কাজী মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ বিএবিটি সাহেব লন্ডন যাত্রা করেন। ১৯১৫ ইং সালে হযরত সূফী হাফেয গোলাম মোহাম্মদ সাহেব প্রথমে কলম্বো, তারপর শ্রীলংকায় গিয়ে জামা'ত কায়েম করেন। এখানে তিন মাস অবস্থান করার পরে তিনি মরিশাস যাত্রা করেন। ১৯১৭ ইং সালের ১৭ এপ্রিল হযরত মুফতী মোহাম্মদ সাদেক সাহেব প্রথমে লন্ডন গিয়ে তবলীগের কাজ করতে থাকেন। তারপর ১৯২০ সনে আমেরিকা যাত্রা করেন। তিনি আমেরিকার প্রথম মুবাল্লেগ ছিলেন। তারপর ১৯১৯ ইং সনে হযরত মৌলভী আব্দুর রহিম নাইয়ার সাহেব প্রথমে লন্ডনে ও পরে ১৯২১ ইং সনে নাইজেরিয়া যাত্রা করেন। ১৯২০ ইং সনে মৌলভী মুবারক আলী খান সাহেব বাঙ্গালী প্রথমে লন্ডন যান। তারপর ১৯২১ ইং সনে সেখান থেকে বার্লিন জার্মানী যাত্রা করেন। তিনি জার্মানীর প্রথম মুবাল্লেগ ছিলেন। তিনি দু'বছর পর অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং তাঁর সাহায্যের জন্য জনাব মালেক গোলাম ফরিদ সাহেবকে কাদিয়ান থেকে জার্মানীতে পাঠানো হয়। তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করলে মৌলভী মোবারক ১৯২৪ ইং সনে মিসর প্রেরিত হন। এভাবে দ্রুত গতিতে তবলীগের কাজ চলতে থাকে। (তারিখে আহমদীয়াত, ৫ খণ্ড-পৃ : ১৬৪)

মোটকথা দেশের ভিতর ও বাইরে চতুর্দিকে মুরুব্বী ও মুবাল্লেগণ হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে যেতে থাকেন এবং তবলীগের কাজ চলতে থাকে।

১৯৩৪ ইং সনে 'মজলিসে আহরারে ইসলাম' মোল্লাদের সংগঠন ঘোষণা করলেন যে, কাদিয়ানের ইট পর্যন্ত গুঁড়িয়ে দেয়া হবে। কিন্তু মুসলেহ মাওউদ (রা.) এতে কোন ভয় পেলেন না বরং আরো প্রবল বেগে জামা'তের প্রচার প্রসার বাড়িয়ে দিলেন। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আল্লাহর ইশারায় তাহরিকে জাদীদ আঞ্জুমানে আহমদীয়া প্রতিষ্ঠা করলেন যারা বিদেশে মসজিদ নির্মাণ, মিশন প্রতিষ্ঠা, মুবাল্লেগ প্রেরণ ও ইসলাম প্রচারের বিশাল কর্মকান্ড দেখা শোনা করবে।

হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদীদেরকেই যে শুধু সাংগঠনিকভাবে সুসংগঠিত করেছিলেন তা নয়। জামা'তের বাইরেও তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও বিচক্ষণতার ছাপ পড়েছে। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত হলো–

(১) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ই কাশ্মিরের জনগণের অধিকার ও স্বাধীনতা আদায়ের সংগঠন, 'অল ইন্ডিয়া কাশ্মির' কমিটি গঠন করেন। এবং ১৯৩১ সনে তিনি এর সভাপতিও ছিলেন।

(২) ভারতের স্বাধীনতার স্বপক্ষেও তিনি অবদান রেখেছেন, খুতবা প্রদান করেছেন। তিনি ব্রিটিশ সরকারকে সম্বোধন করে বলেছেন– '২৫ লক্ষ ভারতীয় সৈন্য ব্রিটিশ সম্রাজ্যকে রক্ষার জন্য যুদ্ধ করেছে। আর আজ তারা তাদের মাতৃভূমির স্বাধীনতা তোমাদের কাছে ভিক্ষা চাচ্ছে। তোমাদের উচিত তাদের এ দাবীকে মানা।' তাঁর এ বক্তব্যকেই পরবর্তীতে চৌধুরী মুহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান সাহেব যিনি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে লর্ড ওয়াবেল গঠিত 'ভারতীয় স্বাধীনতা কমিশনের' প্রধান ছিলেন। তিনি তার হাউজ অব লর্ড এর ভাষণে প্রতিধ্বনিত করেন। এবং তখন অল ইন্ডিয়া রেডিও তা সম্প্রচার করে।

(৩) পাকিস্তান সৃষ্টির ক্ষেত্রেও মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর অবদান ছিল অবিস্মরণীয়। কায়েদে আযম, মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ যখন উপমহাদেশের রাজনীতিতে বীতশ্রদ্ধ হয়ে ইংল্যান্ডে চলে যান, তখন মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর নির্দেশে আমাদের লন্ডন মসজিদের ইমাম তাকে বুঝান এবং আবার পাকিস্তান আন্দোলনে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। পরবর্তীতে জিন্নাহ সব সময়ই হুযূরের পরামর্শ নিতেন।

(৪) ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পূর্বেই হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইহুদী-খৃষ্টানদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে মুসলিম বিশ্বকে সতর্ক করেছিলেন। ফিলিস্তিনে ইহুদীদের কাছে জমি বিক্রি করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়েছিলেন। কিন্তু তারা তা শুনেনি। পরবর্তীতে ১৯৪৮ সালে আবার মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তারা তাও শুনেনি। ফলে আজ তাদের এ অবস্থা।

(৫) দেশ বিভাগের সময় হযরত মুসলেমে মাওউদ (রা.) কে পন্ডিত নেহেরু এ প্রস্তাব দিয়েছিলেন "আপনি ভারতে থাকেন, আমি আপনাকে ভ্যাটিকানের মত স্বাধীন রাষ্ট্র বানিয়ে দিব।" কিন্তু রাজনৈতিক নেতার মুখের আশ্বাস আর প্রলোভনে মুগ্ধ না হয়ে, পাকিস্তানে হিজরত করে আহমদী অধ্যুষিত, সুগঠিত, সুপরিকল্পিত আধুনিক শহর রাবওয়াহ্ গঠন করেন। এটি তার সাংগঠনিক দক্ষতা ও দূরদর্শীতাকে প্রমাণ করে।

এখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর কর্মময় জীবনের আরেকটি দিক তবলীগের দিকে দৃষ্টি দিব। পূর্বেই বলেছি অত্যন্ত অল্প বয়সে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত হন। কিন্তু শুরুতেই প্রচন্ড বিরোধিতার সম্মুখীন হন। এ বিরোধিতা জামা'তের ভিতর বাইর উভয় দিক থেকেই হয়েছিল। জামা'তের একটা বিশেষ অংশ মৌলভী মোহাম্মদ আলী সাহেবের নেতৃত্বে যাদেরকে লাহোরী জামা'ত বলা হয় তারা তাঁর খেলাফতকে অস্বীকার করে এবং জামা'ত থেকে পৃথক হয়ে যায়। ফলে মুসলেহ মাওউদ (রা.)-কে একদিকে লাহোরী জামা'ত, অন্যদিকে সারা দুনিয়ার মুখালেফাতের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে– আহমদীয়াত তথা সত্যিকার ইসলামের দাওয়াত পৃথিবীর কোণায় কোণায় পৌঁছানোর কাজ করতে হয়েছে। আর পৃথিবীর ইতিহাস আজ সাক্ষী তিনি আল্লাহ তাআলার অপার অনুগ্রহ ও ফযলে অত্যন্ত যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়ে এ ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সফলতা লাভ করেছেন। যার কয়েকটি নমুনা এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো। (১) হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-এর তত্ত্বাবধানে ১৯১৪ সনে ইংল্যান্ডে তবলীগী কেন্দ্র চালু হয়। এবং ১৯২৪ সনে লন্ডন ফযল মসজিদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। যে মসজিদে খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯১৫ সালে শ্রীলঙ্কা ও মরিশাসে, ১৯২০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ১৯২১ সালে সিয়েরালিওন, ঘানা, নাইজেরিয়া ও বুখারাতে তবলীগি কেন্দ্র চালু হয়।

এছাড়াও হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.)-ই ভারতের উত্তর প্রদেশের হিন্দুরা ১৯২২ সালে যখন "শুদ্ধি" আন্দোলনের নাম দিয়ে মুসলমানদেরকে জোড় পূর্বক হিন্দু বানাচ্ছিল, তখন এর প্রতিরোধ করেন। জিহাদের ডাক দেন। আহমদী যুবকদেরকে তবলীগের জন্য সেখানে পাঠান। তাদের তবলীগে ধর্মত্যাগীরা ফিরে আসে এবং হিন্দুরা সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়।

জামা'তের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব প্রদানঃ

জামা'তের আভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করা ও কর্মকান্ড সমূহকে বেগবান করার লক্ষ্যে মুসলেহ মাওউদ (রা.) জামা'তকে কয়েকটি অংগসংগঠনে বিভক্ত করেন। ১৯২২ ইং সনে পনের উর্দ্ধ মহিলাদের অঙ্গসংগঠন লাজনা ইমাইল্লাহ প্রতিষ্ঠিত করেন। ১৯৩৮ ইং সনের ১৩ ই জানুয়ারী আহমদী যুবকদের জন্য মজলিসে খোদ্দামুল আহমদীয়া প্রতিষ্ঠিত করেন। এছাড়া ১৯৪০ ইং সনের ২৬শে জুলাই চল্লিশোর্ধ পুরুষদের অঙ্গসংগঠন মজলিস আনসারুল্লাহ গঠন করেন। এই অঙ্গসংগঠনগুলো মূল জামা'তের সাথে সম্পৃক্ত থেকে নিজেদের কর্মকান্ড পরিচালনা করে যার সুফল আমরা বর্তমানে দেখতে পাচ্ছি। জামা'তের সদস্যগণ নিজ নিজ অঙ্গসংগঠনের সাথে যুক্ত থেকে পূর্ণ উদ্দমে কাজ করার ফলে জামা'তীয় কর্মকান্ড অনেক বেগবান হয়েছে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে মাত্র ২৫ বছর বয়সে জামা'তের খেলাফতে আসীন হওয়ায় জামা'তের কতিপয় ব্যক্তি বিদ্রোহ ঘোষণা করেন।

আবার ১৯৩৪ সনে শক্ররা আহমদীয়া জামা'তকে সমূলে ধ্বংস করার পরিকল্পনা করে যে তারা কাদিয়ানের প্রতিটি ইট খুলে নিবে, ধূলিস্যাৎ করে দিবে কাদিয়ানকে। এতদুদ্দেশ্যে তারা জনগণকে উস্কে দিয়ে কাদিয়ান অভিমুখে মিছিল বের করে। আহরার গ্রুপ যখন চরম বিরোধিতায় লিপ্ত তখন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ঘোষণা দেন, "আহরারীরা অচিরেই তাদের পায়ের তলায় মাটি খুঁজে পাবে না।"

তখন তিনি (রা.) জামা'তের কার্যক্রমকে বহির্বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার জন্য সদস্যদের নিকট তাহরীকে জাদীদ এর ঘোষণা করেন। খলীফার এই ঘোষণায় জামা'তের 'বায়তুল মাল' দ্রুত বৃদ্ধি পায় আর যুবকেরা দলে দলে

নিজেদের জীবন উৎসর্গ করে ইসলাম সেবায় ঝাপিয়ে পড়েন। আবার তিনি (রা.) পাকিস্তান ও হিন্দুস্তানের গ্রাম পর্যায়ে তবলীগ করার লক্ষ্যে ওয়াকফে জাদীদ এর ঘোষণা করেন। বর্তমানে এটি সারা বিশ্বব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে।

আবার ১৯৪৭ ইং সনে ভারত বিভাগের সময় জামা'তের কেন্দ্র 'কাদিয়ান' ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ায় জামা'তের অধিকাংশ সদস্যকে কাদিয়ানের বাড়ি ঘর ও সহায় সম্পত্তি ছেড়ে পাকিস্তান হিজরত করতে হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এর নেতৃত্বে জামা'ত কাদিয়ান থেকে হিজরত করে পাঞ্জাবের পশ্চিমে রাবওয়ায় একটি নতুন কেন্দ্র স্থাপন করে। এ জায়গাটি পূর্বে বসবাসের অযোগ্য ছিল। গাছপালা ছিল না। পানি পাওয়াও দুস্কর ছিল। তিনি (রা.) সরকারের নিকট থেকে এ স্থানটি ক্রয় করে রাবওয়া নামকরণ করেন।

আবার ১৯৫২-৫৩ সালে বিরুদ্ধবাদীদের উস্কানীতে পাঞ্জাবে দাঙ্গা সৃষ্টি হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) দৃঢ়তার সাথে উদ্ভূত এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) -এর সুদীর্ঘ বায়ান্ন বৎসর খেলাফতকালে জামা'ত অসাধারণ উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করে। জামা'ত একটি মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়। আহমদীয়াত তথা প্রকৃত ইসলামের প্রচার দুনিয়ার প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে যায়। মুসলেহ মাওউদ সংক্রান্ত ভবিষ্যদ্বাণীগুলো পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। আল্লাহ তাআলার এই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হতে দেখে মোমেনদের হৃদয়ে ঈমান দৃঢ়তর হয়। ভবিষ্যদ্বাণীতে উল্লেখ ছিল, "সোমবার শুভ সোমবার"। সে অনুযায়ী মুসলেহ মাওউদ (রা.) এক শুভ সোমবার এই ধরাধামে আসেন আর এক শুভ সোমবার ১৯৬৫ খৃষ্টাব্দের ৮ই নভেম্বর এই দুনিয়া ছেড়ে খোদা তাআলার সান্নিধ্যে চলে যান।

২৭ ডিসেম্বর ১৯৫৬ ইং তারিখে জলসা সালানা বক্তৃতার মাধ্যমে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) খিলাফতে আহমদীয়ার বিরুদ্ধে একটি গভীর ষড়যন্ত্রের কথা উল্লেখ করে মূল্যবান বক্তৃতা প্রদান করেন। "নেযামে আসমানী কি মুখালেফাত আওর উস্কা পাসে মনযর" নামে বই আকারে ঐ বক্তৃতা প্রকাশিত হয়েছে। ষড়যন্ত্রকারীরা তৃতীয় খলীফার নির্বাচনের সময় নিজেদের পছন্দমত ব্যক্তিকে খলীফা বানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পরেরদিন ২৮শে ডিসেম্বর ১৯৫৬ ইং হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) ঐ জলসায় আর একটা বক্তৃতা প্রদান করেন। এই বক্তৃতা "খিলাফতে হাক্কা ইসলামীয়া" নামে বই আকারে প্রকাশিত আছে। এতে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) পরবর্তীতে খলীফা নির্বাচনের জন্য একটা নীতিমালা বা সংবিধান রচনা করে ঘোষণা করেন। পরবর্তীতে মজলিস শুরার অধিবেশনে তা পাশ হয়ে জামা'তের সংবিধান আকারে গৃহীত হয়। হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) এখানে একটি খলীফা নির্বাচনকারী কমিটি প্রস্তাব করেন। ঐ কমিটিকে 'মজলিসে ইনতেখাবে খিলাফত' বলা হয়েছে। পরবর্তীতে তৃতীয় খলীফার নির্বাচনে হুবহু এ নীতিমালা অনুসরণ করা হয় এবং ঐ মজলিসে ইনতেখাবে খিলাফতের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তারপর চতুর্থ ও পঞ্চম খলীফার নির্বাচনের সময়ও ঐ নীতিমালা এবং ঐ মজলিসে ইনতেখাবের মাধ্যমে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

এই বক্তৃতা হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নিজেকে রুহানী ভাবে হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব (রা.)-এর অনুরূপ বলে ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, হযরত ওমর (রা.)-এর জীবনের শেষ দিকে বিভিন্ন লোকের কথাবার্তার কারণে সিদ্ধান্ত নেন যে, ভবিষ্যতে একটি কমিটি খলীফা নির্বাচন করবে। অতীতে কোন কমিটি বা মজলিস খলীফার নির্বাচন করেনি, সবাই মিলে অনাড়ম্বরভাবে খলীফার নির্বাচন করেছে। কিন্তু ভবিষ্যতে যেহেতু একদল লোক খিলাফতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে অতএব, সর্ব সাধারণের মাঝে নির্বাচন সম্ভব নয়। তাই ভবিষ্যতে মজলিসে ইনতেখাবের সদস্যবৃন্দ খলীফার নির্বাচন করবেন। কমিটি বা নির্বাচনমন্ডলী খলীফা নির্বাচন করবে। হযরত ওমর (রা.) হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর একজন খাস সাহাবী এবং ইসলামের ইতিহাসের একজন অসাধারণ (সকল বিতর্কের উর্ধ্বে) খলীফা ছিলেন। তিনি পরবর্তীকালের খলীফা নির্বাচনের অতীব গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য পালনের জন্য কমিটি করে দিয়েছিলেন এবং ঐ কমিটির সম্মানিত সদস্যগণ হযরত উসমান (রা.)-কে তৃতীয় এবং তারপর হযরত আলী (রা.)-কে চতুর্থ খলীফা নির্বাচিত করেছিলেন। ঐ সুন্নত অনুসরণ করে হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) আহমদীয়া খিলাফতের নির্বাচনের জন্য কমিটি করে দিলেন, আলহামদুলিল্লাহ।

এখানে পুনরায় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হযরত আবু বকর (রা.) যেমন ঐ সময় সকল সাহাবায়ে কেরামের মাঝে দু' একজনের প্রস্তাব অনুসারে সকলের সম্মিলিত সমর্থনে খলীফা হয়েছিলেন এখানে হযরত হেকীম মৌলভী নূরুদ্দীন (রা.) সেভাবেই প্রথম খলীফা নির্বাচিত হয়েছিলেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) ও সেই ভাবেই সর্বসাধারণের জোরালো সমর্থনে খলীফা নির্বাচিত হয়েছেন। হযরত ওমর (রা.) হযরত আবু বকর (রা.) এর মনোনয়ন অনুসারে সকলের সমর্থনে খলীফা হয়েছিলেন। হযরত ওমর (রা.) যেমন পরবর্তীকালের জন্য 'নির্বাচন কমিটি' বানিয়ে দিয়েছিলেন এখানেও তেমন হযরত মুসলেহ মাওউদ (রা.) নির্বাচনের জন্য মজলিসে ইনতেখাবে খিলাফত কায়েম করে দিয়ে গেছেন।

১৯৬৫ সালের ৭ই নভেম্বর সোমবার দিবাগত রাত শেষে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল মুসলেহ মাওউদ (রা.) ইন্তেকাল করেন।

আমাদের দেশের প্রতিটি জামাতেই বরং সমগ্র বিশ্বেই 'মুসলেহ্ মাওউদ' দিবস পালিত হয়, এখন প্রশ্ন হচ্ছে, আমরা তাঁর অসাধারণ কর্মময় জীবন থেকে কতটুকু নিজ জীবনে বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করি। আমাদের প্রত্যেককে ভেবে দেখতে হবে, আমরা কি প্রকৃত আহমদী, আমরা কি হযরত ইমাম মাহদী (আ.) এবং তাঁর খলীফাগণের আদেশের ওপর পরিপূর্ণ আমল করছি? গত ১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ হুযূর (আই.)-তার জুমুআর খুতবায়র একেবারে শেষ দিকে বলেছেন, 'জামাতের বন্ধুদের হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.)-এর জ্ঞান এবং তত্ত্বপূর্ণ রচনাবলী থেকে লাভবান হওয়ার চেষ্টা করা উচিত। এসব বই-পুস্তক রয়েছে উর্দূতেও রয়েছে এবং ইংরেজীতেও রয়েছে, আল্লাহ্ তা'লা সবাইকে তা পাঠের তৌফিক দিন।' এখন আমাদের সবার উচিত হবে শুধু 'মুসলেহ্ মাওউদ' দিবস পালনই যেন উদ্দেশ্য না হয় বরং তাঁর বই-পুস্তক অধ্যায়ন করে নিজ জীবনে তা বাস্তবায়ন করা।

ঘোষণা

অনিবার্য কারণে আমাদের নিয়মিত লেখা 'কলমের জিহাদ' সহ অন্যান্য কিছু লেখা প্রকাশ করা সম্ভব হয় নি।

–বিভাগীয় সম্পাদক

আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিশ্ববাসীর জন্য শান্তি কামনা করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯২তম সালানা জলসা সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান খোদা তা'লার অশেষ কৃপায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের ৯২তম সালানা জলসা গত ৫, ৬ ও ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় কার্যালয় ঢাকার বকশীবাজারে অনুষ্ঠিত হয়। জলসা উপলক্ষ্যে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করেন মোহতরম মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের সাহেব। জলসার প্রথম দিনের কার্যক্রম শুরু হয় জুমুআর নামাযের পর। এতে সভাপতিত্ব করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি। প্রথমে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন হাফেজ মোহাম্মদ আবুল খায়ের। এরপর উদ্বোধনী ভাষণ প্রদান করেন সভাপতি সাহেব। তিনি তার উদ্বোধনী ভাষণে তাশাহ্হুদ, তাউয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর জলসায় আগমনের উদ্দেশ্যে হুযূরের (আই.) সালাম সবাইকে পৌঁছে দেন। এরপর জলসায় আগমনের উদ্দেশ্য, গুরুত্ব এবং অংশগ্রহণকারীদের কর্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, এ জলসায় আপনারা অনেক বিষয়ের উপর মূল্যবান বক্তৃতা শুনতে পাবেন। এই কথাগুলো আগামী জলসা পর্যন্ত নিজেদের মধ্যে ধরে রাখবেন যেন আগামী জলসাতে নব-উদ্যমে কাজ করতে পারেন। তাক্বওয়া সম্বন্ধেও তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেন। আর তা হলো,তাক্বওয়ার মূল উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করা শিখতে হবে।

পরিশেষে তিনি আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদের সকলকে এই মহতি জলসা থেকে রূহানী ফায়দা হাসিল করার তৌফিক দান করুন এই দোয়া করে তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এরপর নযম পাঠ করেন জনাব কাশেম হোসাইন পিয়াস।

বক্তৃতাপর্বে 'মহান আল্লাহ তা'লার অস্তিত্ব ও গুণাবলী' বিষয়ে বক্তৃতা করেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি কুরআন, হাদীস, যুক্তি-প্রমাণ ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরীখে তাঁর বক্তব্য উপস্থাপন করে বলেন, আল্লাহ তালার অস্তিত্বের সপক্ষে সর্বপ্রথম একটি খুবই সহজ যুক্তি উপস্থাপন করতে চাই। যুক্তিটি খুব সহজ হলেও শক্তিশালী। আর তা হলো- পৃথিবীতে হাজার হাজার ধর্ম রয়েছে। তাদের মাঝে ভৌগলিক সীমা, ভাষা, ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসের হাজারো মত-পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও তারা সবাই বিশ্বজগতের একজন স্রষ্টা রয়েছেন -এ বিষয়ে একমত। সার্বজনীন এই বিশ্বাস ও ঐক্যমত্য এই চিরন্তন সত্যকে প্রমাণ করে এর পিছনে কোন শক্তিশালী সত্তার হাত রয়েছে, যিনি পুরো বিষয়টি নিয়ন্ত্রন করছেন। এ সত্তাই হলেন আল্লাহ তা'লা।

তিনি আরো বলেন, আল্লাহ তা'লার অস্তিত্বের বিষয়ে সাক্ষ্য দিয়েছেন এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী-রসূল। আমরা কোন কিছু বিশ্বাসের জন্য কয়জন লোকের সাক্ষ্য নেই। একজন, দুজন, চারজন। এর বিপরীতে এক লক্ষ চব্বিশ হাজার এই চরম সত্যবাদীদের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করা যায় না।

এরপর তিনি বৈজ্ঞানিক প্রমাণ উপস্থাপন পর্বে

বক্তব্য রাখছেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নূরুল আমীন

বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ

বিখ্যাত দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকনের একটি উক্তি -"বিজ্ঞানের স্বল্প জ্ঞান মানুষকে নাস্তিক বানিয়ে দেয়, কিন্তু বিজ্ঞান সম্পর্কে গভীর পড়াশুনা মানুষকে আস্তিক করে তোলে। বিজ্ঞানীরা বর্তমানে সৃষ্টিকর্তার বিভিন্ন রূপকে একে একে বাতিল করছে কিন্তু সৃষ্টিকর্তার বিশ্বাসকে বাতিল করছে না।" তুলে ধরে তিনি আরো বলেন, এ কারণেই আমরা দেখি সর্বকালের সেরা বিজ্ঞানী স্যার আইজেক নিউটন, আইনেস্টাইন, ড. সালাম এরা সবাই আস্তিক ছিলেন। এছাড়া তিনি বিগব্যাং, মহাসম্প্রসারণ তত্ত্ব, বিগকাঞ্জ, বস্তুর অবিনাশিতাবাদ ইত্যাদি বিষয়ে অবতারণা করে আল্লাহ্ তা'লার অস্তিত্বের প্রমাণ তুলে ধরেন।

সবশেষে তিনি বলেন, আল্লাহ তালার অস্তিত্বের সবচে বড় প্রমাণ হলো তাঁর সাথে প্রত্যেকের পারসোনাল কন্ট্রাক্ট বা ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া। সব যুক্তি প্রমাণ একদিকে আর এই প্রমাণ একদিকে। এরপরও এরই পাল্লা ভারি। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)এর প্রদত্ত উপমার ভাষায় বলছি– দূরে ধোয়া দেখে আগুন আছে এ ধারনা জন্মাতে পারে। তবুও এতে দৃঢ় বিশ্বাস হবে না সত্যিই এটা আগুন কিনা? তারপর কাছে গিয়ে আগুন দেখলে মনে হবে আগুন। কিন্তু এরপরও দৃঢ়বিশ্বাস জন্মাবে না এটা আগুন কিনা। তবে কাছে গিয়ে আগুন স্পর্শ করলে, আঙ্গুল জ্বলে গেলে নিশ্চিত বিশ্বাস হবে এটা আগুন। এজন্য নিশ্চিত বিশ্বাসের জন্য সমস্ত যুক্তি-প্রমাণের উর্ধ্বে আল্লাহ তালার স্পর্শ পাওয়া আবশ্যক। ব্যক্তিগত সম্পর্ক হওয়া আবশ্যক।

এরপর 'বিশ্ব শান্তির দূত মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই সূরা আল আম্বিয়ার, ২১: ১০৮ নং আয়াত তিলাওয়াত করেন। যার অর্থ হলো-" আর আমরা তোমাকে বিশ্বজগতের জন্য কেবল এক রহমত রূপেই পাঠিয়েছি।" এরপর তিনি বলেন, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হলেন আমাদের রসূলে করীম (সা.)। আর তাঁর আদর্শ হলো সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমতস্বরূপ। তাঁর জীবনী আমরা পর্যালোচনা করলে দেখতে পাই,তিনি কখনও কারো সাথে খারাপ আচরণ করেননি। এমনকি তাঁর শত্রুদের সাথেও নয়। উদাহরণস্বরূপ,হুদায়বিয়ার সন্ধিতে "রসূলুল্লাহ" (সা.) শব্দটিও তিনি শত্রুদের খাতিরে কেটে দিয়েছিলেন। পৃথিবীতে অশান্তির মূল কারণ হলো অর্থনৈতিক দূরাবস্থা। দারিদ্রের কষাঘাতের কারণে এতো অশান্তি সৃষ্টি হচ্ছে। এজন্যই নবী করীম (সা.) একহাতে সম্পদ কুক্ষিগত করতে নিষেধ করেছিলেন। একারণেই ইসলামে যাকাত দেয়ার প্রথা চালু করেছিলেন। ফলে গরীবের আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

বর্তমানে পৃথিবীতে সুদের কারণেও অশান্তি বিরাজ করছে। সর্বত্র সুদের প্রচলন আমরা দেখতে পাচ্ছি। সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের এথেকে বিরত থাকতে হবে। উদাহরণ দিতে গিয়ে তিনি এক সাহাবীর কথা বলেন,জনৈক এক সাহাবী একটি ঘোড়া কিনতে গিয়েছিল আরেক সাহাবীর কাছে। যখন ঘোড়ার দাম কম চাওয়া হলো তখন ঐ সাহাবী যিনি ঘোড়া কিনতে গিয়েছিল বললেন,এর দাম তো অনেক কম চেয়েছ। হয় দাম বাড়াও নয়তো আমি নিবোনা। এভাবে দু'জনের তর্কা-তর্কি চলতে লাগলো। অবশেষে বিক্রেতা সাহাবী দাম বাড়াতে বাধ্য হলেন আর তখনই তিনি উপযুক্ত মূল্যে ঘোড়াটি কিনলেন। দেখুন,নবী করীম (সা.) কত উত্তম শিক্ষা সাহাবীদের দিয়েছিলেন।

এভাবে মওলানা সাহেব তার বক্তৃতায় বিভিন্ন ঘটনাবলীর প্রতি আলোকপাত করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে শান্তির দূত হিসেবে প্রমাণিত করেন। পরিশেষে আমাদেরকেও এই নসীহত মেনে চলার পরামর্শ দিয়ে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এরপর 'কুরআন তিলাওয়াতের গুরুত্ব ও কুরআন চর্চা' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই সূরা বাকারার তৃতীয় আয়াত তিলাওয়াত করেন যার অর্থ হলো, এই সেই পূর্ণাঙ্গ কিতাব যাতে কোন সন্দেহ নেই। এ হলো মুত্তাকিদের জন্য হিদায়াত অর্থাৎ পথনির্দেশ। প্রথমে তিনি এই আয়াতের প্রেক্ষাপট বর্ণনার মাধ্যমে কুরআন শরীফের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

বক্তব্য রাখছেন মওলানা মুহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

তিনি বলেন, এই কুরআনেই সকল জাতির জন্য নির্দেশনা রয়েছে। যারাই একে মানবে তারাই কল্যাণমন্ডিত হবে। এছাড়া তিনি মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কবিতার একটি পংতি তুলে ধরেন, দিল মে এহি হ্যা হারদাম তেরা সাহীফা চুমুঁ, কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ, কাবা মেরা এহি হ্যা। মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই পংতির মাধ্যমে তিনি বলেন, মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আগমনই হয়েছে মহানবী (সা.)-কে সারা বিশ্বে পরিচয় করিয়ে দেয়ার জন্য। কুরআন এসেছে তাক্বওয়া অবলম্বন করার জন্য। আর মহানবী (সা.)-এর হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি আখেরী জামানায় মানুষের মাঝ থেকে এই খোদাভীতি উঠে যাবে। ইসলামের নাম চিহ্নও অবশিষ্ট রইবে না। আর সেই হারানো ঈমান, হারানো খোদাভীতি মুসলমানদেরকে ফিরিয়ে দেয়ার দায়িত্ব ইমাম মাহ্দীর (আ.)।

তিনি আরো বলেন, আহমদ হচ্ছেন মুহাম্মদের প্রতিবিম্ব কেননা আহমদের ভাষায় মুহাম্মদকে (সা.) খুব সহজেই চেনা যায়। আর সূরা

ফাতিহা হলো কুরআন শরীফের সারাংশ। এটি এতই কল্যাণমন্ডিত একটি দোয়া যে, প্রতিটি ইবাদতেই এই দোয়াটি পাঠ করতে হয়।

এছাড়া তিনি বক্তৃতার শেষাংশে বিভিন্ন ঘটনাবলী পেশ করেন যা থেকে আমরা স্পষ্ট বুঝতে পারি কুরআন কত বরকতময় একটি গ্রন্থ আর এটি পাঠ করলে কত কল্যাণ মানুষ পেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ সূরা নূরের আয়াত তিলাওয়াতের ফলশ্রুতিতে এক ব্যক্তির সাত জন কন্যা সন্তানের পর এক পুত্র সন্তান হবার সুসংবাদের ঘটনা আমরা তার কাছ থেকে জানতে পারি। ইস্তেগফারের মাধ্যমে এক ব্যক্তির পুত্র সন্তান লাভের ঘটনাও আমরা জানতে পারি। পরিশেষে তিনি খোদার দরবারে কি ভাষা ব্যক্ত করে অথবা কিরকম ব্যকুলতা নিয়ে দোয়া করতে হয় তা বর্ণনা করে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন। এই বক্তৃতার মাধ্যমেই জলসার প্রথম দিনের অধিবেশন সমাপ্ত হয়।

সন্ধ্যা ৭ টায় এমটিএ-এর মাধ্যমে লন্ডনে প্রদত্ত হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা সকলেই মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সরাসরি শ্রবণ করেন। খুতবা শেষে অ-আহমদী মেহমানদের নিয়ে বিশেষ প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়, যা রাত ১১টা পর্যন্ত চলে। এই সভায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, ন্যাশনাল আমীর, মুবাল্লেগ ইনচার্জসহ অন্যান্য মুরব্বী, মুয়াল্লেমগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এতে প্রায় কয়েক শতাধিক অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতা উপলব্ধি করে বেশ কয়েকজন মেহমান হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) এর জামাতে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

জলসার দ্বিতীয় দিনের প্রথম অধিবেশন শুরু হয় সকাল ৯.৩০ মি: এ জনাব মসীহ উর রহমান এর পবিত্র কুরআন পাঠ এবং মওলানা সুলতান মাহমুদ আনওয়ার-এর নযম পাঠের মাধ্যমে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম মেজর (অব.) বি আকরাম খান চৌধুরী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুর।

বক্তৃতাপর্বে 'নামায প্রতিষ্ঠার তাৎপর্য এবং আমাদের করণীয়' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতেই কুরআনের আলোকে নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব দর্শকদের উদ্দেশ্যে তুলে ধরেন। এবং কুরআন শরীফে শুধুমাত্র ইসলাম ধর্মের জন্যই নামাযের শিক্ষা দেয়া হয়নি বরং প্রতিটি ধর্মের জন্যই এই শিক্ষা আল্লাহ্‌ তা'লার পক্ষ থেকে দেয়া হয়েছিল

বক্তব্য রাখছেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান

তা-ও উল্লেখ করেন। উদাহরণ স্বরূপ তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল (সা.)-এর পূর্বে আগত কয়েক জন নবীর কথা উল্লেখ করেন যাদেরকে আল্লাহ্‌ তা'লা নামায প্রতিষ্ঠার আদেশ দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি নবী করীম (সা.)-এর হাদীস এবং হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর বাণী থেকেও নামায প্রতিষ্ঠার গুরুত্ব ও তাৎপর্য তুলে ধরেন। পরিশেষে এ প্রেক্ষিতে আমাদের করণীয় কি তা বর্ণনা করে তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এরপর 'ইসলামে পর্দার গুরুত্ব' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, ডাক্তার মনিরুল ইসলাম। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতে কুরআনের আলোকে ইসলামী পর্দার নিয়ম কানুন তুলে ধরেন। ইসলাম ধর্মে নারী পুরুষ উভয়ের পর্দার ব্যাপারে কি শিক্ষা দেয় তাও তিনি তুলে ধরেন। ইসলাম কোন কঠোরতা পছন্দ করে না।

বক্তব্য রাখছেন ডাক্তার মনিরুল ইসলাম

উদাহরণ স্বরূপ একজন মহিলা যদি অসুস্থ হন তবে তাকে পর্দার খাতিরে মহিলা ডাক্তার না পাওয়া সত্ত্বেও পুরুষ ডাক্তারের চিকিৎসা গ্রহণ করতে পারবে না এই শিক্ষা ইসলাম দেয় না বরং প্রয়োজন হলে পুরুষ ডাক্তারের নিকট

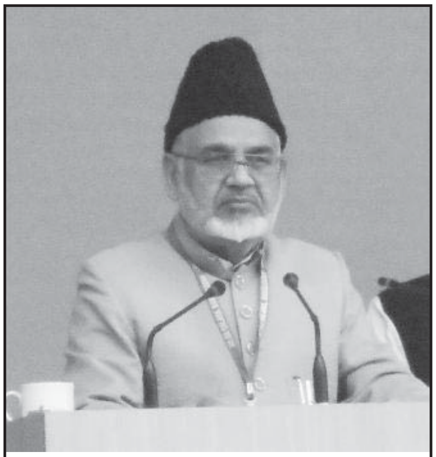

বক্তব্য রাখছেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের

যাওয়া যাবে এবং কোন সংকোচ ছাড়াই বিস্তারিত বর্ণনার মাধ্যমে চিকিৎসা গ্রহণ করতে হবে কেননা এটি একজন মানুষের জীবন মরনের ব্যাপার। এভাবেই বক্তা তার বক্তৃতাকে উৎকৃষ্ট উপমার মাধ্যমে সকলের সামনে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেন। খিলাফতে আহমদীয়ার বিভিন্ন খলীফার উক্তি দিয়ে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এ পর্যায়ে নসীহতমূলক বিশেষ ভাষণ প্রদান করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি মওলানা সৈয়দ শামশাদ আহমদ নাসের। তিনি তাঁর বক্তৃতার শুরুতে হযরত মসীহ্‌ মাওউদ (আ.)-এর পুস্তক আল-ওসীয়্যত থেকে কুদরতে সানীয়ার উল্লেখ করেন। তিনি দ্বিতীয় কুদরত অর্থাৎ খিলাফতের প্রতি বিশ্বস্ততা এবং পূর্ণ আনুগত্য দেখানোর নসীহত করেন। একই সাথে তিনি বলেন, একজন মানুষের নামায ততক্ষণ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হয় না যতক্ষণ না সে খিলাফতের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রদর্শন করে। তাই তিনি আমাদের সকলকে বেশী বেশী খলীফায়ে ওয়াক্তের নিকট দোয়া চেয়ে চিঠি লেখার পরামর্শ দেন। তিনি এটিও বলেন, আমরা যেন শুধু দুঃসময়ে হুযূরের কাছে দোয়া না চাই বরং আমাদের খুশির মুহূর্ত গুলোও যেন খলীফার সাথে ভাগাভাগি করি। এভাবে তিনি বিভিন্ন নসীহত মূলক কথা দিয়ে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর 'দোয়ার তত্ত্ব এবং এর কার্যকারিতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ। তিনি বক্তৃতার শুরুতেই আবেগাপ্লুত হয়ে পবিত্র কুরআন শরীফ থেকে সবচেয়ে উত্তম দোয়া সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত করেন। এর পাশাপাশি তিনি বলেন, এই সূরা একজন বিপথগামীকে পথনির্দেশনা দান করে।

বক্তব্য রাখছেন মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী

জলসায় উপস্থিত শ্রোতাদের একাংশ

একজন দুরারোগ্যকে ব্যধিমুক্ত করে। সূরা ফাতিহার এতই কল্যাণ যে, আল্লাহ্ তা'লা এটিকে তাঁর গ্রন্থের শুরুতেই উপস্থাপন করেন। মওলানা সাহেব দোয়া কবুলীয়তের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করে আমাদের উদ্দেশ্যে এটিই বুঝাতে চেয়েছেন যে, দোয়ার মতো কার্যকারিতা অন্য কিছুতে সম্ভব নয়।

বিকালের অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২.৪৫ মি: এ জনাব বশীরুদ্দিন আহমদ-এর পবিত্র কুরআন পাঠ এবং জনাব মোসাউয়ের আহমদ ও তার দলের দলীয় কাসিদা পাঠের মাধ্যমে। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ঢাকা।

এতে 'সমকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, জনাব মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্, ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, পাক্ষিক আহমদী। তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতা তাঁর কৃত ভবিষ্যদ্বাণী থেকে দর্শকদের সামনে তুলে ধরেন। এছাড়া সমকালীন বিশ্বে কিভাবে

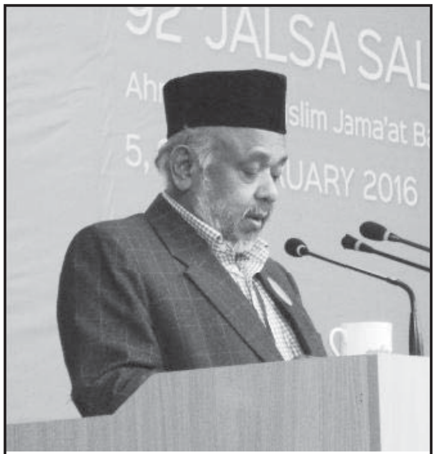

বক্তব্য রাখছেন জনাব মুহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্

অশান্তি, অরাজকতা এবং অপসংস্কৃতি চারদিকে ছড়াচ্ছে আর এ থেকে পরিত্রাণের উপায় কি তা-ও বর্ণনা করেন। একই ভাবে বিভিন্ন ভবিষ্যদ্বাণী উল্লেখ করে কিভাবে তা সমকালীন বিশ্বে পরিপূর্ণতা পেয়েছে তা পরিষ্কারভাবে তিনি বর্ণনা করেন। এছাড়া তিনি আরো বলেন, সেই যুগে পবিত্র কুরআনের শিক্ষাকে অবমাননা করে আর মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষ্কলুষ চরিত্রের প্রতি অবমাননা করে ভারতীয় উপমহাদেশের ভিন্ন ধর্মাবলম্বীরা হীন পন্থায় আক্রমণ চালাচ্ছিল, তেমনিকালে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আয়াতের সত্যতা ও সৌন্দর্য প্রতিষ্ঠিত করতে আর মহানবী (সা.) কৃত ভবিষ্যদ্বাণী পুর্ণতায় এবং ইসলামের আদি ও অকৃত্রিম ও অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা পুন:প্রতিষ্ঠা আর বিশ্ব ব্যাপী তা ছড়িয়ে দিয়ে খোদা বিমুখ মানুষকে পুনরায় খোদা মিলনের স্বাদে অভিষিক্ত করতে আল্লাহ তা'লা স্বয়ং তাঁকে দাড় করান।

১৯০৮ সনে তাঁর পরলোকগমনের পর মহানবী (সা.) বর্ণিত হাদীস "খেলাফত আলা মিনহাজেন নবুওয়ত" অর্থাৎ নবুওয়তের পদ্ধতিতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া সম্পর্কীত ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতে খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়। আল্লাহ তা'লার করুনা ধারায় সিক্ত হয়ে আজও ৫ম খলীফা হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর জ্যোতির্ময় সত্তায় তা জগতকে সেই একই আলো বিতরণ করে চলছে, আলহামদুলিল্লাহ।

জগতে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) যত দিন জীবিত ছিলেন তাঁর পুরোটাকাল তিনি তাঁর মনিব ও প্রভু হযরত মুহাম্মদ (সা.) আনিত ইসলামের সুমহান শিক্ষা ও তাঁরই অনুপম আদর্শ প্রতিষ্ঠায় ৮৮ খানা পুস্তক, ৯০ লক্ষাধিক চিঠি-পত্র ছাড়াও বহু প্রবন্ধাদিও রচনা করেছেন যা তৎকালে পত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হয়ে পবিত্র কুরআনের মর্যাদা, মহানবী (সা.)-এর শ্রেষ্ঠত্ব আর ইসলামের সত্যতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

তিনি তাঁর আবির্ভূত হওয়ার সত্যতার স্বপক্ষে পবিত্র কুরআন ও হাদীস থেকে বহুবিধ দলীল প্রমাণ ছাড়াও হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ ঐশী নিদর্শন উপস্থাপন করেছেন যা বুঝতে পেরে লক্ষ লক্ষ সত্যান্বেষী সত্যপরায়ণ পবিত্র চেতা ব্যক্তিবর্গ তাঁরই জীবদ্দশায় তাঁকে গ্রহণ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো উল্লেখ করেন, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর ওপরে অবতীর্ণ একটি ইলহাম ছিল "আহলে বাঙ্গাল কি দিল জুয়ী হোগী" অর্থাৎ বাংলার অধিবাসীদের মনস্তুষ্টি করা হবে। বঙ্গভঙ্গ রদ সহ আরো বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের মাধ্যমে বাংলার অধিবাসীদের মনস্তুষ্টি আজও করা হচ্ছে। যাদের মনস্তুষ্টি আল্লাহ্ তা'লা এত ব্যাপকভাবে করছেন যে, গত এক বছরে আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশে ১১ বার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে, তার কোন কোনটির ভূকম্পন মাত্রা রিকটার স্কেল অনুযায়ী ব্যাপক ক্ষতি সাধনের কথা থাকলেও আল্লাহ্ তা'লা নিজ করুনায় আমাদের জান মালের সুরক্ষা দান করেছেন, আলহামদুলিল্লাহ্। এমন অসাধারণ করুনা প্রদর্শন করে আমাদের মনস্তুষ্টির কারন ঘটিয়েছেন মহান আল্লাহ্ তা'লা। অতএব, এর কৃতজ্ঞতার এক দায়ভার অবশ্যই আমাদের ওপর বর্তায়। এ জন্য আমাদের উচিত, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সত্যতাকে আমাদের স্বজাতির সামনে সবিস্তারে তুলে ধরা আর দোয়া করা যে, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে সমাগত সত্যকে বুঝবার ও মানবার সৌভাগ্য দান করুন।

শেষে তিনি সমকালীন বিশ্ব প্রেক্ষাপটে অশান্তি থেকে নিস্তার লাভ করতে কিভাবে বিভিন্ন

রাষ্ট্রপ্রধানগণ আহমদীয়া জামাতের খলীফাকে তাদের দেশে শান্তির বার্তা পৌছানোর দাওয়াত দিচ্ছেন তা-ও তিনি অতি সুন্দর বিবৃতির মাধ্যমে উল্লেখ করে তার বক্তৃতা সমাপ্ত করেন।

বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী

এরপর 'মানবতার সেবায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত' বিষয়ে বক্তব্য রাখেন, আলহাজ্জ আহমদ তবশির চৌধুরী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-৫, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতার শুরুতে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মোটো 'ভালোবাসা সবার তরে ঘৃণা নয়কো কারো পরে' এই বাণী পাঠের মাধ্যমে সবাইকে মানবতার সেবায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

তারপর একে একে জামাতে আহমদীয়ার বিশ্বব্যাপি মানবসেবার এক সংক্ষিপ্ত চিত্র অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুঁটিয়ে তুলেন। হিউম্যানিটি ফার্স্টের কথা বলেন যারা কিনা অহরাত্র মানবতার সেবায় নিবেদিত আছে। আফ্রিকার এমনও অনেক মন্ত্রী রয়েছেন যারা কিনা আহমদীদের প্রতিষ্ঠিত স্কুল কলেজেই লেখা পড়া করেছেন। স্বেচ্ছায় রক্তদান কেন্দ্র সহ এমনই অভিভূত প্রকল্পের সাথে আহমদীয়া মুসলিম জামাত বহু পূর্ব থেকেই সম্পৃক্ত। ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মানবতাই সবচেয়ে বড়, এটিই ইসলামের শিক্ষা। এই বলে তিনি তার বক্তৃতা শেষ করেন।

এরপর 'সন্ত্রাসবাদ বনাম ইসলামে শান্তির শিক্ষা' বিষয়ে মওলানা আব্দুল আউয়াল খান চৌধুরী, নায়েব আমীর ও মুবাল্লেগ ইনচার্জ, বাংলাদেশ বক্তব্য রাখেন, তিনি বলেন, ইসলাম ব্যতিত অন্যান্য ধর্মালম্বী কিছু গোষ্ঠী ইসলামের বিরুদ্ধে এই আপত্তি উত্থাপন করে যে, ইসলাম নাকি সন্ত্রাসবাদের শিক্ষা দেয়। কোথায় পেলো তারা এই শিক্ষা আমার বোধগম্য নয়। সকলের সামনে এই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়ে মওলানা সহেব তার বক্তৃতা শুরু করেন। এরপর কুরআন করীমের সূরা হজ্জের ৪০ থেকে ৪২ নম্বর আয়াত তিলাওয়াত করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা তুলে ধরেন। মুসলমানগণ আল্লাহ্ তা'লার আদেশেই যুদ্ধ শুরু করেছিল আর সেটি ছিল আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। একাধারে দশ বছর অত্যাচার সহ্য করার পরে যখন দেখা গেল আল্লাহ্ তা'লার সর্বশ্রেষ্ঠ শরীয়ত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম তখনই মহান আল্লাহ্ তা'লা এই আদেশ দিয়েছিলেন কিন্তু হাদীস মূলে আমরা জানতে পারি এটি সবচেয়ে ছোট জিহাদ। যেখানে ইসলাম আত্মশুদ্ধিকে বড় জিহাদ আখ্যায়িত করে সেখানে মুষ্টিমেয় কতগুলো লোক ইসলামকে সন্ত্রাসবাদে পরিণত করছে। এরকম যুক্তি পাল্টা যুক্তির ক্রমধারায় তিনি প্রমাণ করে দেখান ইসলাম সন্ত্রাসবাদের কোন শিক্ষা দেয় না বরং বিশ্বব্যাপি শান্তির আরেক নাম ইসলাম।

জলসার এই অংশে মেহমানগণ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। এতে পর্যায়ক্রমে বক্তব্য রাখেন, ওমর বিন আব্দুল আযীয (তানিম), কাউন্সিলর, ঢাকা দক্ষিন সিটি করপোরেশন। তিনি বলেন, আহমদীদের মানব সেবা দেখে তিনি অভিভূত হন। কিছুদিন পূর্বে আমাদের জামাতে একজন নিষ্ঠাবান কর্মীর কাছে জানতে পারেন আমরা একশ জন স্বেচ্ছাসেবী তার সেবায় উপস্থিত করতে রাজী আছি। তিনি বলেন, সমস্ত শহর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করার কাজে আজ পর্যন্ত আমি এমন কোন দৃষ্টান্ত দেখতে পাইনি। এর চেয়ে বড় মানব সেবা আর কি হতে পারে।

এরপর করুণা ভিক্ষু, বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের ভাইস প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখেন, তিনি তার সম্ভাষণে সবার উপরে মানবতাকেই রেখেছেন। মানবতা নিয়ে গৌতম বুদ্ধের শিক্ষা কি তা-ও তিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। কোন দুঃখি ব্যক্তি সে যে ধর্মেরই হোক না কেন তার সেবা করাই বুদ্ধের পরম আদর্শ। আর এভাবেই কোন মানুষ নির্বান লাভ করতে পারে।

এরপর শ্রী শাসনপ্রিয় ভিক্ষু, ভারত থেকে আগত বক্তব্য রাখেন। আহমদীদের ভালোবাসার শ্লোগানকে তিনি সাধুবাদ জানান। এছাড়া মানবতার সেবা অত্যন্ত কঠিন সাধনার ফল তা-ও তিনি গৌতম বুদ্ধের জীবনাদর্শ থেকে উল্লেখ করেন। পরিশেষে আমাদের উদ্দেশ্যে বলে যান, "জগতের সকল প্রাণী সুখি হোক, দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করুক"।

এরপর শ্রী রবীন্দ্র ঘোষ, আইনজীবি তথা বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচ-এর প্রেসিডেন্ট বক্তব্য রাখেন। কিছুদিন পূর্বে রাজশাহীর বাগমারায় আমাদের মসজিদে যে আত্মঘাতি বোমা হামলা হয়েছিল সে ঘটনার প্রেক্ষিতে তিনি তার মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে তৎক্ষনাৎ সেখানে ছুটে যান আর্তমানবতার সেবায়। তিনি বলেন, আমি সেরকম একটি দুঃসহ পরিস্থিতিতেও জামাতে আহমদীয়ার যে অতিথি আপ্যায়ন করেছে তা দেখে সত্যিই অভিভূত। এ আচরণ একজন মানুষ কোন উত্তম শিক্ষার পরিণতিতে করতে পারে তা আমি বুঝতে পারি। এজন্য আমি অন্তরের অন্তস্থল থেকে আপনাদেরকে আপনাদেরকে আমার ভালোবাসা এবং সালাম জানাই।

এরপর ফ্রান্সেস বেঞ্জামিন ডি কস্তা, ভাইস চ্যান্সেলর নটরডেম কলেজ, ঢাকা বক্তব্য রাখেন। একজন মনীষির বাণী দিয়ে তিনি তার বক্তৃতা শুরু করে বলেন, হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ,

জলসায় আমন্ত্রিত মেহমানগণের কয়েকজন শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন

খ্রিস্টান এ সবগুলোর মাঝে মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। আমি ব্যক্তিগতভাবে মানবসেবার কাজে থাকতেই পছন্দ করি।

এরপর ফাদার তপন ডি রোজারিও, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্ত ধর্মীয় বিভাগের অধ্যাপক বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, খ্রিষ্টান বলুন, মুসলমান বলুন, হিন্দু বলুন, আমাদের সকলের শক্তি হচ্ছে সম্মিলিত সৌম্য ও সৌহার্দ্য।

এরপর কাজী রেহান সোবহান, মানবাধিকার কর্মী বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, আমার বাবা বিচারপতি এ.কে.এম সুবহান সাহেব আপনাদের জামাতকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। আপনাদের দাওয়াত পেয়েছেন অথচ আমার বাবা সেখানে যান নি এমনটি আমি কখনোই হতে দেখে নি। আমার বাবা মারা যাওয়ার পরে আমিও তার ভালবাসায় এই জামাতকে ছাড়তে চাই নি। কারণ আমি জানি, আপনারা সর্বদা সৃষ্টির সেরা মানবের কল্যাণে নিয়োজিত।

এরপর শ্রী কাজল দেবনাথ, হিন্দু, বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বক্তব্য রাখেন, তিনি সবার শান্তি কামনা করেন।

পরিশেষে মমিনুল ইসলাম নামক একজন আমাদের শুভাকাঙ্খী আমাদেরকে নিয়ে তার রচিত একটি কবিতা জলসায় আগমনকারী সকলের উদ্দেশ্য পাঠ করে শুনান।

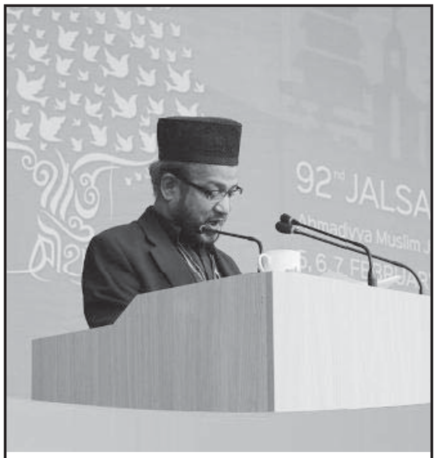

বক্তব্য রাখছেন মওলানা বশিরুর রহমান

সন্ধ্যায় অ-আহমদী মেহমানদের নিয়ে বিশেষ প্রশ্নোত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়, যা রাত ১১.৩০ পর্যন্ত চলে। এই সভায় হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি, ন্যাশনাল আমীর, মুবাল্লেগ ইনচার্জসহ অন্যান্য মুরব্বী, মুয়াল্লেমগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এতে প্রায় কয়েক শতাধিক অ-আহমদী মেহমান উপস্থিত ছিলেন। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের সত্যতা উপলব্ধি করে বেশ কয়েকজন মেহমান হযরত ইমাম মাহ্দী (আ.) এর জামাতে বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়া মুসলিম জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হন।

জলসার চতুর্থ অধিবেশন শুরু হয় ৭ ফেব্রুয়ারি

সন্ধ্যায় অ-আহমদী মেহমানদের নিয়ে বিশেষ প্রশ্নোত্তর সভা

বক্তব্য রাখছেন প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী

সকাল ৯-৩০ মি.। এতে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মওলানা মোহাম্মদ সালাহ উদ্দিন। উর্দূ নযম পাঠ করেন জনাব শাহরিয়ার রেজা জোসেফ।

বক্তৃতা পর্বে 'আর্থিক কুরবানী হলো খোদা প্রেমের আবশ্যক শর্ত' এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা বশিরুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ। তিনি তার বক্তৃতায় পবিত্র কুরআন, হাদীস এবং হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি উপস্থাপন করেন। তিনি তার বক্তৃতায় এটাই স্পষ্ট করেন যে, নামায ছাড়া খোদা তা'লা লাভ করা সম্ভব নয়। খোদাকে লাভ করার একমাত্র মাধ্যম হচ্ছে নামায। শেষে তিনি সকলকে এই আহ্বান জানান, আমরা সবাই যেন নিষ্ঠার সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করি।

এরপর 'বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভূমিকা' বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন, মোহতরম প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বলেন, ইসলাম যেভাবে সহনশীলতা প্রকাশ করে তা অন্য কোন ধর্মে প্রকাশ করে না। এটা ইসলামের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। একমাত্র ইসলামই দাবি করে যে, সকল মানুষকে একই উৎস থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ইসলামে কোন প্রকার ভেদাভেদের শিক্ষা দেয়া হয়নি। সমগ্র বিশ্বে আহমদীয়া মুসলিম জামাত একক খলীফার নেতৃত্বে কিভাবে শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজে রত তাও উল্লেখ করেন।

এ পর্যায়ে বাংলা নযম পাঠ করেন আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান।

এরপর 'আহমদীয়া মুসলিম জামাত বাংলাদেশের ওপর বর্ষিত আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি' বিষয়

বক্তব্য রাখছেন আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

উল্লেখ করে বিশেষ বক্তব্য রাখেন আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। তিনি তার বক্তৃতায় বিগত বছরে আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ওপর কিভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুগ্রহরাজি প্রকাশ করেছেন তার উল্লেখ করেন। তিনি তার বক্তব্যে সুদৃশ্য মসজিদ নির্মাণ, প্রত্যন্ত এলাকায় তবলীগে সফলতা আর জামাতের সদস্যদের আর্থিক কুরবানীসহ নানাবিধ বিষয়ের উদাহরণ তুলে ধরেন।

এই অনুষ্ঠানে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দুই জন মন্ত্রী শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। প্রথমে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন। মন্ত্রীদ্বয় তাদের বক্তব্যে বাংলার আবহমান অসাম্প্রদায়িক ঐতিহ্যের উল্লেখ করে বলেন, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার, বাংলাদেশে সকল ধর্মের লোকদের শান্তি প্রিয়ভাবে সহাবস্থান প্রয়োজন এবং ইসলামে ধর্ম নিরপেক্ষতার শিক্ষা দেয়া হয়েছে, ইসলাম জঙ্গীবাদকে সমর্থন করে না।

বিকাল ১২.৩০টায় বাংলাদেশের কৃতী ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন হুযূর (আই.)-এর সম্মানিত প্রতিনিধি ও ন্যাশনাল আমীর সাহেব।

জলসার সমাপ্তি অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ২-৪৫মি.। সমাপ্তি অনুষ্ঠান পরিচালিত হয় লন্ডন থেকে। এতে সভাপতিত্ব করেন নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন মোহতরম মওলানা ফিরোজ আলম, ইনচার্জ বাংলা ডেস্ক, লন্ডন। নযম পরিবেশন করেন জনাব সুলতান আহমদ। এরপর হুযূর (আই.) তাহের হল থেকে বাংলাদেশ জলসার সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন যা এমটিএ-এর মাধ্যমে সরাসরি বিশ্বের সকল আহমদীসহ অন্যান্যরা উপভোগ করেন।

সমাপনী বক্তব্যে হযরত মীর্যা মাসরূর আহমদ (আই.), হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) জলসায় অংশগ্রহণ সম্পর্কে যে সকল শিক্ষণীয় ও নৈতিক উপকারীতার বর্ণনা দিয়েছেন সেগুলোর উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো, সৃষ্টিকর্তার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন, এবং নিজেদের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার উন্নতি। খলীফাতুল মসীহ বলেন, এ সকল আকাঙ্খাই হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.) পোষণ

শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখছেন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় তথ্য মন্ত্রী জনাব হাসানুল হক ইনু এবং বেসামরিক বিমান ও পর্যটন মন্ত্রী জনাব রাশেদ খান মেনন

বাংলাদেশ জলসার সমাপ্তি অধিবেশনে লন্ডনের তাহের হল থেকে বক্তব্য রাখছেন
নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া জামাতের বর্তমান খলীফা হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.)

করেছিলেন এবং তাঁর সাহাবীদের মধ্যেও এগুলো পরিলক্ষিত হয়েছিল। তিনি বলেন, জলসায় অংশগ্রহণ সফল করার জন্য, আল্লাহ্ তা'লার প্রত্যাশা অনুযায়ী হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) যে স্তরের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রয়োজন তা অর্জনের জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।

হুযূর (আই.) এই দোয়া করে তাঁর বক্তব্য শেষ করেন, যেন প্রত্যেকেই তাঁর সৃষ্টিকর্তার সাথে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন করতে পারেন এবং মহানবী (সা.) খোদা প্রদত্ত যে শিক্ষা আমাদের দিয়ে গেছেন আমরা যেন সত্যিকার অর্থেই তা বোঝার সামর্থ্য লাভ করি। খোদা তা'লা আমাদেরকে মানবজাতির অধিকার আদায় এবং ইসলামের সঠিক ও শান্তিপূর্ণ বাণী প্রচারের তৌফিক দান করুন। হুযূর (আই.) জলসার সমাপনী অধিবেশন দোয়ার মাধ্যমে শেষ করেন। এতে বাংলাদেশসহ বিশ্বের অন্যান্য দেশের অনেক আহমদীও অংশ নেন।

ঢাকায় তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত জলসায় ৫ হাজার আটশরও বেশি মানুষ অংশ নেন, এছাড়াও লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জলসার সমাপনী অধিবেশনে তিন হাজার ৭শরও বেশি ব্যাক্তি অংশ গ্রহণ করেন।

এবারের জলসায় কাদিয়ান, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা প্রভৃতি দেশ হতে বেশ কয়েকজন প্রবাসী বাঙ্গালীসহ মেহমান অংশগ্রহণ করেন, আলহামদুলিল্লাহ্।

জলসার সংবাদ বাংলাদেশের কয়েকটি জাতীয় পত্রিকায় ছবিসহ প্রকাশিত হয়। যেমন নিউ এইজ, ইনডিপেন্ডেন্ট, নিউনেশন, প্রথম আলো, নয়া দিগন্ত, জনকণ্ঠ এবং দৈনিক জন্মভূমি। পুরো জলসার কার্যক্রম ইন্টারনেটের মাধ্যমে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়েছে, যার ফলে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আহমদীরা বাংলাদেশের এই জলসার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছেন।

[ডেস্ক রিপোর্ট]

ছবি: সুমন মাহমুদ, মাসুদ আহমদ কুরাইশী এবং এমটিএ বাংলা।

হুযূর (আই.)-এর দোয়া পরিচালনার মাধ্যমে ৯২তম সালানা জলসার সমাপ্তি ঘটে

সংবাদ

মাহিগঞ্জের বড়দরগাহ্ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৭/০১/২০১৬ রোজ রবিবার আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মাহিগঞ্জের বড়দরগাহ হালকায় লাজনা ইমাইল্লাহ্ মাহিগঞ্জের উদ্যোগে সীরাতুন নবী (সা.) জলসা ও প্রশ্ন-উত্তর সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র প্রেসিডেন্ট। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ইসরাত জাহান বর্না। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন নার্গিস আক্তার। নযম পাঠ করেন সাবিলা বেগম ও জেসমিন আক্তার। মহানবী (সা.) এর জীবন নিয়ে পর্যায়ক্রমে আলোচনা করেন হোসনেয়ারা বেগম, কবিতা আক্তার ও জেসমিন আক্তার। এরপর নসিয়তমূলক বক্তব্য রাখেন মৌ. আসলাম আহমদ ও জনাব আব্দুল খালেক। আলোচনা শেষে প্রশ্ন-উত্তর পর্ব আরম্ভ হয়। দোয়ার মাধ্যমে জলসার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়। এতে ১৯ জন মেহমান ও ২৫ আহমদী উপস্থিত ছিলেন।

জেসমিন আক্তার

তেজগাঁও জামাতের মনিপুড়ি পাড়ায় সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত

গত ১৪ ফেব্রুয়ারি, রোজ রবিবার বিকাল ৪টায় ৮৬, মনিপুড়ি পাড়ায় লায়লা নার্গিসের বাসায় এক সীরাতুন নবী (সা.) জলসা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সাবিহা আমজাদ, মিরপুর লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট, বাংলাদেশ লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র জেনারেল সেক্রেটারী রেহেনা খায়েরসহ প্রায় ৩০ জন লাজনা, নাসেরাত, আতফাল এবং ৪ জন মেহমান উপস্থিত ছিলেন। কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান শুরু হয়। কুরআন তেলাওয়াত করেন তাহেরা পারভীন। দোয়া পরিচালনা করেন সির্দাতুল আনোয়ারা। হাদীস পাঠ করেন নুসরাত জাহান, নযম পরিবেশন করেন নাবিলা চৌধুরী। বক্তৃতাপর্বে হযরত মুহাম্মদ (সা.) জীবনের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ওপর আলোকপাত করেন তামান্না হাকীম। আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়ার গুরুত্ব ও কবুলিয়তের ওপর বক্তব্য রাখেন ফারহানা মাহমুদ তন্বী। মহানবী (সা.)-এর অতুলনীয় গুনাবলীর ওপর আলোকপাত করেন মাহমুদা আক্তার রিমি। হুযূর (আই.)-এর সাম্প্রতিক খুতবা পড়ে শোনান রেহেনা খায়ের। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন রেখেনা খায়ের। সবশেষে কাসিদা ও দোয়ার মাধ্যমে জলসার কার্যক্রম সমাপ্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ্।

ফারহানা মাহমুদ তন্বী

নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনা'র নাসোরত দিবস উদযাপন

গত ২৫ জানুয়ারি নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার উদ্যোগে নাসেরাত দিবস পালন করা হয়। নাসেরাত দিবসে সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফাতেহা দিশা। এরপর দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী।

নযম পেশ করেন লাবিবা আফ্রাদ। নাসেরাত দিবসে কুরআন তেলাওয়াত, নযম, বক্তৃতা ও দোয়া পরীক্ষা নেয়া হয়। উক্ত নাসেরাত দিবসে শিশু ও নাসেরাতসহ মোট ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। সবশেষে পুরস্কার বিতরণ ও আহাদের মাধ্যমে দিবস শেষ হয়।

নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার তালিম-তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

গত ২৪-২৫ জানুয়ারি নাসেরাতুল আহমদীয়া খুলনার ২ দিন ব্যাপী তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত তালিম তরবিয়তী ক্লাসে সভানেত্রী ছিলেন আঞ্জুমানারা রাজ্জাক, প্রেসিডেন্ট, লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন ফতেহা দিশা। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন লাবিবা আফ্রাদ। নাসেরাতদের তালিম তরবিয়ত ক্লাসের সিলেবাসের ওপর ভিত্তি করে ক্লাস নেওয়া হয়। ক্লাসে নামায শিক্ষা, কুরআন শিক্ষা, দোয়া ও হাদীস ইত্যাদি বিষয়ে ক্লাস নেয়া হয়। ক্লাসে শিশু ও নাসেরাতসহ মোট ১৪ জন উপস্থিত ছিলেন। সর্বশেষ সভানেত্রী সাহেবা লাজনা নাসেরাত বোনদের উদ্দেশ্যে নসীহতমূলক বক্তব্য রাখেন। এরপর পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাসের সমাপ্তি ঘটে।

শামীমা ইয়াসমিন

লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় নির্দেশ অনুযায়ী লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনার উদ্যোগে গত ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি তারিখে তালিম তরবিয়তী ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত ক্লাসে সভানেত্রী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ্ খুলনা। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মিনান্নাহার মফিজ। দোয়া পরিচালনা করেন সভানেত্রী। নযম পেশ করেন তাহেরা মাজেদ (রাফা)। হাদীস পাঠ করেন আছিয়া জামান নোভা। উদ্বোধনী ঘোষণা দেন সভানেত্রী। এছাড়া স্থায়ীয় তালিম তরবিয়ত ক্লাসের সিলেবাস অনুযায়ী কুরআন ক্লাস, উর্দু ক্লাস, নযম ক্লাস, দোয়া, বক্তৃতা এবং উন্মুক্ত আলোচনা করা হয়। পুরস্কার বিতরণী ও দোয়ার মাধ্যমে ক্লাস শেষ করা হয়। এতে ২ দিনে মোট উপস্থিত ছিল গড়ে ৪৫ জন।

রোকসানা মঞ্জুর ডলি

সন্তানদের বিয়ে-দোয়ার আবেদন

আল্লাহ্‌র ফযলে আমাদের ছোট মেয়ে বারিরা নুসরাতের বিয়ে গত ১০ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে চট্টগ্রাম নিবাসি জনাব মোজাম্মেল হক আনসারি সাহেবের ছোট ছেলে মিজানুল হক শাহীন সাহেবের সাথে ২,৪০,০০০/- টাকা মোহরানায় সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

অনুরূপভাবে গত ২৮ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে আমাদের ছোট ছেলে নাভিদুর রহমান, মুরব্বী সিলসিলাহ্‌র বিয়ে নারায়ণগঞ্জ নিবাসি মরহুম তাহের আহমদ প্রধানের একমাত্র মেয়ে খাদিজা বেগমের সাথে পচাশি হাজার টাকা মোহরানায় সম্পন্ন হয়, আলহামদুলিল্লাহ। বিয়ের এলান হয় নারায়ণগঞ্জ মসজিদে।

সকল আহমদী ভাই বোনদের কাছে দোয়ার আবেদন করছি। জাযাকুমুল্লাহ।

খাকসার

মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী

প্রিন্সিপাল, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ।

মিরপুর জামাতে মুসলেহ্ মাওউদ দিবস অনুষ্ঠিত

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, মিরপুরে গত ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬ মুসলেহ্ মাওউদ দিবস যথাযথ মর্যাদার সাথে উদযাপন করে। জনাব সৈয়দ আব্দুল হান্নান- এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভা শুরু হয়। আলোচনা সভার শুরুতে কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মওলানা সুলতান মাহমুদ আনোয়ার। দোয়া পরিচালনা করেন সভাপতি। নযম পাঠ করেন জনাব ফিরোজ আলম। মুসলেহ্ মাওউদ দিবসের গুরুত্ব ও কল্যাণ বিষয়ের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য রাখেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ। অতপর মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) শিক্ষার আলোকে আমাদের করনীয় বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন মৌ. হাফেজ আবুল খায়ের, মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ। সভাপতির ভাষণ ও দোয়ার মাধ্যমে সভার কাজ শেষ হয়। একে প্রায় ২০০ জন উপস্থিত ছিলেন।

মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম মিল্টন

শোক সংবাদ

অত্যন্ত দুঃখের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্য মরহুম ডাঃ মেজর আসাদ-উজ-জামান এর পৌত্র, মরহুম আশরাফু-উজ-জামান-এর একমাত্র ছেলে মোহাম্মদ ওয়াসিম-উজ-জামান গত ৩ জানুয়ারি দিবাগত রাত্রে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন) মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ২৭ বছর। তিনি মৃত্যুর সময় এক কন্যা সন্তান (দেড় বছর) ও স্ত্রী রেখে গেছেন। চট্টগ্রামস্থ আহমদীয়া মসজিদ 'বায়তুল বাসেত'-এ বাদ যোহর তার জানাযা হয়। বিপুল সংখ্যক আহমদী সদস্য তার অ-আহমদী বন্ধু, অফিস কলিগ ও তার ছাত্ররা তার জানাযায় অংশ নেয়। আল্লাহ্ তা'লা যেন মরহুমকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারকে ধৈর্য্যধারণ করার শক্তি দান করেন, আমরা আমাদের একমাত্র ভাইকে অকালে হারিয়েছি, আমাদের জন্য বিশেষ ভাবে দোয়া কামনা করছি।

নওশিন আনজুম (বোন)

ফতুল্লা

মিরপুরে তবলিগী রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত

মহান আল্লাহ্ তা'লার অশেষ ফজলে মজলিস আনসারুল্লাহ্ মিরপুর এর উদ্যোগে গত ২১ শে ফেব্রুয়ারি ২০১৬ইং বরিবার মিরপুর মসজিদে দিন ব্যাপী তবলিগী রিফ্রেশার্স কোর্স অনুষ্ঠিত হয়। কেন্দ্র হতে আগত মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ এই তবলিগী ট্রেনিং ক্লাস পরিচালনা করেন। বাদ আসর হতে রাত ৯.৩০ মি. পর্যন্ত চলমান এই ক্লাসে মোট ৫৫ জন অংশগ্রহণ করেন। কোর্সের উদ্বোধনী ও স্বাগত বক্তব্য রাখেন স্থানীয় যয়ীম আলা জনাব আবু জাকির আহমদ। ক্লাসে মুসলমানের সংজ্ঞা, আহমদীয়া জামাতের ধর্ম বিশ্বাস, খাতামান নবীঈন, হযরত ইসা (আ.) এর জীবন-মৃত্যু, হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতা, বয়আতের গুরুত্ব ইত্যাদি বিষয়ে কুরআন ও হাদীসের আলোকে বিশদভাবে সকলকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এছাড়াও স্থানীয় মোয়াল্লেম হাফেজ আবুল খায়ের তবলিগী ক্ষেত্রে একজন তবলিগীকারিকে যে সকল বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত সে সম্পর্কে সকলকে সচেতন করেন। মজলিস আনসারুল্লাহ্ বাংলাদেশের সাবেক সদর জনাব মোহাম্মদ হাবিবুল্লাহ তবলীগ ও তরবীয়তী ক্ষেত্রে যুগ খলিফা (আই.) এর আকাংঙ্খা পূরণের লক্ষ্যে ব্যাক্তিগত তরবিয়তী মান উন্নয়ন এবং তবলিগী ক্ষেত্রে আরও অধিক দায়ীত্বশীলতা, দোয়া ও নিষ্ঠার সাথে সামনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সকলকে উদ্বুদ্ধ করেন। স্থানীয় কয়েকজন সদস্যও তবলিগী ক্ষেত্রে তাদের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন এবং এই কার্যক্রম সচল রাখার অঙ্গীকার করেন। মজলিস আনসারুল্লাহ বাংলাদেশের নায়েব সদরবৃন্দ, ঢাকা জেলা ও রিজিওনাল নাযেমগণ ও এতে উপস্থিত ছিলেন।

ইমতিয়াজ আলী

ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা তারুয়ায় সফলতার সাথে সমাপ্ত

মহান আল্লাহ্'লার অশেষ কৃপায়, ব্রাহ্মণবাড়িয়া অঞ্চলের আঞ্চলিক সালানা জলসা আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়ায় গত ২৯ ও ৩০ জানুয়ারি, রোজ শুক্রবার ও শনিবার শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে ভাবগাম্ভির্যময় পরিবেশে মসজিদে বাশারতের বিশাল মাঠে সাফল্যজনকভাবে অনুষ্ঠিত হয়, আলহামদুলিল্লাহ।

২৯ জানুয়ারি শুক্রবার সকালে উদ্বোধনী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন মোহতরম আলহাজ্জ মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন থেকে তেলাওয়াত করেন মৌ. তাহের আহমদ। এরপর সভাপতি সাহেব উদ্বোধনী ভাষন ও দোয়া পরিচালনা করেন। ভাষণে তিনি জলসা সালানার গুরুত্ব ও প্রয়োজনিয়তা তুলে ধরেন। বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামাতের ভুমিকার কথাও তিনি উল্লেখ করেন এবং সকলকে দোয়ার আহবান জানান। এ পর্যায়ে উর্দূ নযম পরিবেশন করেন জনাব এস এম হাবিবউল্লাহ। বক্তৃতা পর্বে মহানবী (সা.) এর বিনয় ও নর্মতা বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা শামসুদ্দিন

আহমদ মাসুম, মুরব্বী সিলসিলাহ। এরপর বাংলা নযম পেশ করেন জনাব যিকরে এলাহী। এরপর হযরম ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাব ও বয়আত করার গুরুত্ব এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা শাহ মোহাম্মদ নুরুল আমীন, মুরব্বী সিলসিলাহ। আমি কেন আহমদী হলাম এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন নও মোবাঈন আহমদী জনাব শাহেদ আহমদ।

২য় অধিবেশন শুরু হয় বিকাল ৩.০০ টা হতে, এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মোহতরম প্রফেসর মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীল-১, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন জনাব শফিউল আজম শশী, উর্দূ নযম পরিবেশন করেন জনাব সুপান আহমদ। বক্তৃতা পর্বে ইসলামে নারীর মর্যাদা ও পর্দার গুরুত্ব এ বিষয়ে জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করেন জনাব মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ, সাবেক সদর, মজলিস আনসারুল্লাহ, বাংলাদেশ। এরপর কুরআন করীমের অতুলনীয় শান ও মর্যাদা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন মওলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ। এরপর নযম পরিবেশন করেন জনাব এনামুল হক ইন্টু। এরপর মসীহ মাওউদ (আ.)-এর রসূল প্রেম এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন মওলানা মোহাম্মদ সোলায়মান, মুরব্বী সিলসিলাহ। আমি কিভাবে আহমদী হলাম এ বিষয়ে চট্টগ্রাম থেকে আগত নও মোবাঈন জনাব জামাল আহমদ সুন্দরবভাবে অশ্রুসিক্ত হৃদয়ে তার আহমদীয়াত গ্রহণের ইতিহাস তুলে ধরেন। এরপর শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন জনাব বাদল সাদীর, চেয়ারম্যান, তারুয়া ইউনিয়ন পরিষদ। বাদ মাগরিব তবলিগী প্রশ্নত্তোর অনুষ্ঠান ও এমটিএ তে হুযূর (আই.) এর খুতবা দেখেন সবাই।

জলসার তৃতীয় অধিবেশন শুরু হয় ৩০ শে জানুয়ারি শনিবার সকাল ৯.৩০ হতে। এতে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন মোহতরম মোবাশশের উর রহমান, ন্যাশনাল আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। পবিত্র কুরআন হতে তেলাওয়ান করেন জনাব কাওসার আহমদ মঞ্জুর, উর্দূ নযম পেশ করেন জনাব মনির আহমদ ভুইয়া। বক্তৃতা পর্বে খলীফা ওয়াক্তের প্রতি আনুগ্রত্যের অনুপম দৃষ্টান্ত সমূহ এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মঞ্জুর হোসেন, আমীর, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, ব্রাহ্মণবাড়িয়া। এরপর সুললিত কন্ঠে হিন্দি নযম এবং একটি বাংলা নযম পেশ করেন আলহাজ্জ ইব্রায়েতুল হাসান। বর্তমান পেক্ষাপট ও যুগ খলিফার নির্দেশনা এ বিষয়ে বক্তব্য রাখেন জনাব মাহবুবুর রহমান, জেনারেল সেক্রেটারী, আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। শুভেচ্ছা বক্তব্য পেশ করেন মোহতরম মীর মোবাশ্বের আলী, নায়েব ন্যাশনাল আমীর-১। শুকরিয়া জ্ঞাপন করেন জনাব জহির আহমদ মিয়াজী, সেক্রেটারী আঞ্চলিক জলসা সালানা-২০১৬। ইসলামের শিক্ষা পরিপূর্ণ ভাবে পালন করলেই এবং বিশ্বনবী মহানবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর আদর্শ মেনে চললেই বিশ্বময় শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে সকলের প্রতি এই আহবান জানিয়ে মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেব নিরব দোয়ার মাধ্যমে এ আধ্যাত্মিক জলসার সমাপ্তি ঘোষনা করেন।

উক্ত জলসায় আশে পাশের এবং বিভিন্ন স্থানীয় জামাত থেকে আহমদী ও মেহমানবৃন্দ সর্বমোট ২২৫০ জন উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গ্রামের নেতৃত্বস্থানীয় অ-আহমদী বেশ কিছু মেহমানবৃন্দও জলসায় অংশগ্রহণ করেন। জলসায় ০৮ জন বয়আত গ্রহণ করে আহমদীয়াত তথা খাঁটি ইসলামে শামিল হয়েছেন। জলসায় পুরুষ ও লাজনাদের জন্য পৃথক জলসা গাহ, পৃথক থাকার স্থান সহ পৃথক খাবার স্থানের সুন্দর ব্যবস্থাপনা ছিল। জলসা গাহ ও পাশ্ববর্তী এলাকায় শোনার জন্য মাইকের ব্যবস্থা ছিল। এতে আরও প্রায় হাজার খানেক গ্রামবাসী সামীল হয়। জলসার সংবাদ স্থানীয় ৬টি পত্রিকায় ছবিসহ সংবাদ প্রচার করা হয়। আল্লাহ্ তা'লার ফজলে সর্বদিক থেকে সাফল্যজনকভাবে আঞ্চলিক জলসা সালানা সমাপ্ত হয়, আলহামদুলিল্লাহ। জলসাকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন সকলের জন্য দোয়ার আবেদন করছি।

জহির আহমদ মিয়াজী
সেক্রেটারী
আঞ্চলিক জলসা সালানা-২০১৬
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, তারুয়া

fzj ms‡kvab

পাক্ষিক আহমদী ১৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬ ইং সংখ্যায় ৮৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত জলসায় নযম পাঠরত Ô Bgivb mvB`Õ এর পরিবর্তে 'দৌলত আজিম ভূঁইয়া' নাম ভুল ছাপা হয়েছে। অনাকাঙ্খিত এ ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

পাঠকদের অংশগ্রহণে নিয়মিত প্রকাশ হচ্ছে 'পাঠক কলাম'। আগামী পাঠক কলামের বিষয়-

"বিশ্বের নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে প্রকৃত মুসলমানের করণীয়।"

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ মার্চ, ২০১৬-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

পাঠকের সুবিধার্থে পরবর্তী আরো এক সংখ্যার পাঠক কলামের বিষয় নিম্নে দেওয়া হল।

১। ইসলামে ওয়াদা রক্ষার গুরুত্ব।

*** আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।**

*** লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।**

*** লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।**

বিঃ দ্রঃ পাঠকরা যদি কোন বিষয় নিয়ে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঠক কলামে লিখতে চান তাও পাঠাতে পারেন।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
ন্যাশনাল সেক্রেটারী, ইশায়াত
আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail:
pakkhik_ahmadi@yahoo.com
masumon83@yahoo.com

আন্তর্জাতিক জামা'তি সংবাদ

আহমদীয়া মুসলিম জামাত বেনিনের 'তিনজি' জামাতে নবনির্মিত একটি আহমদীয়া মসজিদের শুভ উদ্বোধন

আল্লাহ্ তা'লার অপার কৃপায় গত ২২ জানুয়ারি, ২০১৬ তারিখে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বেনিন এর বোহিকো অঞ্চলের তিনজি (Tindji) জামাতে একটি নবনির্মিত মসজিদ উদ্বোধন করা হয়। ২০১৫ সালের ২২ অক্টোবর এর ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছিল। বেনিন এর আমীর সাহেব একটি প্রতিনিধি দল নিয়ে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করেন।

আহমদীয়া জামাত, তিনজির প্রেসিডেন্ট সাহেব সকল অতিথি অর্থাৎ, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার ও সমাজের গণ্যমাণ্য ব্যক্তিবর্গকে এই অনুষ্ঠানে স্বাগত জানান। মোহতরম আমীর সাহেব তার বক্তৃতায় বলেন, 'আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে খুবই শান্তিপূর্ণ একটি ধর্ম দান করেছেন যার নামের মধ্যেই শান্তি ও নিরাপত্তার নিশ্চয়তা নিহিত রয়েছে অর্থাৎ ইসলাম। ফিতা কাটার সময় উপস্থিত সবাই উচ্চস্বরে **'রাব্বানা তাকাব্বাল মিন্না ইন্নাকা আনতাস সামিউল আলীম'** দোয়া পাঠ করতে থাকে। এরপর সম্মিলিত দোয়া করা হয় এবং জুমুআর নামাযের জন্য সবাই মসজিদে প্রবেশ করেন।

১৩ মিটার দৈর্ঘ এবং ১০ মিটার প্রশস্ত এই মসজিদে ৩৭৫জন মুসল্লী একত্রে নামায আদায় করতে সক্ষম হবেন। মসজিদের সামনের অংশে ছোট্ট একটি প্রাঙ্গন বানানো হয়েছে আর এখানেও ১২৫জন মুসল্লী নামায পড়তে পারবেন। এছাড়া ১৩ মিটার উঁচু ২টি মিনারও নির্মাণ করা হয়েছে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ১৩টি জামাতের প্রতিনিধি সহ মোট উপস্থিত ছিলেন ৬১৫জন। আলোহোন (অষড়যড়হ) জামাত থেকে ১৪জনের একটি প্রতিনিধি দল পায়ে হেঁটে এই মহতি অনুষ্ঠানে যোগদান করেন বলে জানা গেছে। এই মহৎ কর্মের সাথে যুক্ত সবাইকে আল্লাহ্ তা'লা উত্তম পুরস্কারে ভূষিত করুন।

জামেয়া আহমদীয়া, যুক্তরাজ্যের ৪র্থ সমাবর্তণ অনুষ্ঠান

জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্য ২০০৫ সাল হতে শুরু হওয়ার পর থেকে সারা বিশ্বের সেসব নিষ্ঠাবান শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে আসছে, যারা আহমদীয়াত অর্থাৎ সত্যিকার ইসলামের শান্তির বাণী বিশ্বময় প্রচারের উদ্দেশ্যে নিজেদের জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত। জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ৭ বছর ব্যাপি এই শিক্ষাকার্যক্রম শিক্ষার্থীদের সর্বোত্তম পন্থায় তাঁদের কর্তব্য পালনের প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে।

জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের শিক্ষার্থীরা এক্ষেত্রে বড়ই সৌভাগ্যবান, কারণ তারা তাদের শিক্ষাজীবনে নিয়মিতভাবে নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর সাথে সাক্ষাত লাভ করে এবং সরাসরি তাঁর দিকনির্দেশনা ও দোয়া লাভ করে।

গত ১৬ জানুয়ারী, ২০১৬ যুক্তরাজ্যে অবস্থিত সারে'তে অনুষ্ঠিত হয় গেল জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের ৪র্থ সমাবর্তন অনুষ্ঠান। নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামাতের প্রধান হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)-এর স্বশরীরে উপস্থিতি অনুষ্ঠানটিকে আশিষমন্ডিত করেছে। এ সময় হুযূর সফল স্নাতকপ্রাপ্তদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন এবং দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য প্রদান করেন স্নাতকপ্রাপ্ত ও শিক্ষার্থিদের উদ্দেশ্যে।

এ বছর শাহেদ ডিগ্রী অর্জনকারী জামেয়া আহমদীয়া কানাডার ছাত্ররাও যুক্তরাজ্যে আসেন যৌথভাবে অনুষ্ঠিত ২০১৫ সালের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে যোগ দেয়ার লক্ষ্যে।

অনুষ্ঠানের শুরুতেই সংক্ষিপ্ত রিপোর্ট পেশ করেন জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্যের শিক্ষা বিষয়ক চেয়ারম্যান জনাব জহির আহমদ খান। তিনি বলেন, এ বছর জামেয়া আহমদীয়া যুক্তরাজ্য থেকে ৭ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম সফলভাবে সম্পন্ন করে মোট ১৭ জন শাহেদ ডিগ্রী অর্জন করেছেন।

জামেয়া আহমদীয়া কানাডার প্রিন্সিপাল জনাব হাদী আলী চৌধুরী তাঁর রিপোর্টে উল্লেখ করেন যে, এ বছর সর্বমোট ৮ জন শিক্ষার্থী শাহেদ ডিগ্রী অর্জনের মাধ্যমে সফলতার সাথে ৭ বছরের শিক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করে।

এই পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে স্নাতক প্রাপ্তরা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর থেকে হাত থেকে বিশেষ পুরস্কার ও সার্টিফিকেট গ্রহণ করেন। এছাড়া যারা বিভিন্ন ক্লাসে অধ্যয়নরত শিক্ষার্থিদেরও নিজ নিজ ক্লাসে সর্বোচ্চ ফলাফল অর্জন করায় হুযূর পুরস্কার প্রদান করেন।

এই বিশেষ অনুষ্ঠানকে স্মরণীয় করে রাখতে শিক্ষার্থীদের অভিভাবক এবং জামাতের বিভিন্ন স্তরের অতিথিদের আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং শিক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানানো হয়।

হুযূর আনোয়ার (আই.) সকল শিক্ষার্থী এবং উপস্থিত সবার উদ্দেশ্যে প্রদত্ত বক্তৃতায় পুরস্কার প্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে নির্দেশনা দেন এবং স্নাতক অর্জনকারীরা কীভাবে কর্মক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব পালন করবে সে সম্পর্কে হিদায়াত প্রদান করেন।

তিনি আরো বলেন, আজকের পৃথিবীতে অনেক শিক্ষক রয়েছেন যারা চেষ্টা করেন মানুষকে শেখাতে এবং এমনকি মানুষকে ভাল পথে পরিচালিতও করতে চান, কিন্তু শুধুমাত্র আহমদী মুবাল্লিগরাই সত্যিকার অর্থে জানে কীভাবে সৃষ্টিকর্তার ভালোবাসা লাভ করা যায় এবং কীভাবে মানুষকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র কাছে নিয়ে আসা যায়। হুযূর নবাগত মুবাল্লিগদের তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিয়ে বলেন, তাদের দায়িত্ব মানুষদের সাহায্য করা যাতে করে সর্বশক্তিমান খোদার সাথে তাদের সুসম্পর্ক গড়ে উঠে; আর এটি শুধুমাত্র আন্তরিকভাবে খোদার ইবাদত এবং দোয়ার মাধ্যমেই সম্ভব। তিনি বলেন, মুবাল্লিগদের উচিত আল্লাহ্‌র ইবাদত এবং নামায প্রতিষ্ঠার বিষয়ে যত্নবান হওয়া।

হুযূর বলেন, যেখানেই যান না কেন প্রত্যেক মুবাল্লিগেরই উচিত হবে একজন আদর্শ ও অনুকরণীয় ব্যক্তিতে পরিণত হওয়া, যেহেতু তারাই এখন সমাজের প্রতিনিধি। এজন্য বিশেষ মনোযোগ দেয়া উচিত তরুণ সমাজের প্রতি কেননা তারাই আহমদীয়াতের ভবিষ্যৎ কর্ণধার। প্রত্যেকেই যেনো সফল মুবাল্লিগ হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করতে পারে- এই দোয়ার মাধ্যমে হুযূর অনুষ্ঠানের ইতি টানেন।

এই অনুষ্ঠানের পরপরই হুযূর আনোয়ার (আই.) নামায পড়ান। এরপর সম্মানিত অতিথিদের উদ্দেশ্যে সুস্বাদু খাবার পরিবেশন করা হয়, যা অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাই উপভোগ করেন।

অষ্ট্রেলিয়ার বন্দরনগরী অগাস্তা'তে পবিত্র কুরআন ও পুস্তক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত

গোটা বিশ্বে ইসলামের সঠিক শিক্ষা এবং শান্তির বাণী প্রচার করাই আহমদীয়া মুসলিম জামাতের মুল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য এবং। ইসলাম সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে অবহিত করতে পারলেই ইসলামের শান্তির বার্তা সবার কাছে পৌঁছানো সম্ভব। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এবং বিভিন্ন ভাষার মানুষের কাছে পবিত্র কুরআনের বাণী পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে আহমদীয়া মুসলিম জামাত ৭০টির অধিক ভাষায় পবিত্র কোরআন শরীফ অনুবাদ করেছে। বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে আহমদীয়া মুসলিম জামাত পবিত্র কুরআন প্রদর্শনীর আয়োজন করছে।

সাউথ অস্ট্রেলিয়ার বন্দরনগরী অগাস্তাতে এ নিয়ে দ্বিতীয়বারের মত পবিত্র কুরআনের প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ্। এই শহরটি এডিলেড হতে ৩৫০ কি:মি: উত্তরে অবস্থিত।

১৬জন আহমদীর একটি দল পোর্ট অগাস্তা শহরের প্রাণকেন্দ্রে এই প্রদর্শনীটির আয়োজন করেন। সকাল ৯.৩০ মিনিটে প্রদর্শনী সবার জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়। সাধারণ দর্শকরা অনেক উৎসাহের সাথে পুরো প্রদর্শনী ঘুরে দেখেন।

দক্ষিণ এডিলেডের প্রেসিডেন্ট জনাব ফরীদ বাজওয়া বলেন, "হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর নির্দেশক্রমে এবং অস্ট্রেলিয়াবাসীর কাছে ইসলামের বাণী পৌঁছে দিতে আমরা দ্বিতীয় বারের মত অগাস্তা'তে এসেছি। এই প্রদর্শনী আয়োজন খুবই সফল হয়েছে এবং স্থানীয় জনগণের কাছে থেকে আমরা অভূতপূর্ব সাড়া পেয়েছি।" এছাড়া প্রদর্শনীতে Life of Mohammad (মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিত), The Philosophy of the Teachings of Islam (ইসলামী নীতি-দর্শন) এবং The World Crisis and The Pathway to Peace (বিশ্ব সংকট ও শান্তির পথ) ইত্যাদি বই-পুস্তকও প্রদর্শন করা হয়।

প্রদর্শনী চলাকালে আহমদী স্বেচ্ছাসেবকদের ৫টি দল শহরের প্রধান সড়কে মানুষের মাঝে প্রায় ১০,০০০ লিফলেট বিতরণ করে। আল্লাহ্‌র অপার অনুগ্রহে দিনটি ছিল সাফল্যে ভরা। মহান আল্লাহ্ আমাদেরকে ইসলামের শিক্ষা সবার মাঝে প্রচারের তৌফিক দান করুন। আমীন।

আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানির উদ্যোগে তবলীগি সভা অনুষ্ঠিত

ধর্মীয় বিদ্বেষ দূর করার লক্ষ্যে কয়েকটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংগঠনের সমন্বয়ে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করা হয় জার্মানীতে অবস্থিত থুরিগেন অঙ্গরাজ্যে। কিছুদিন আগে এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে এ সংগঠনের প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রায় আট হাজারেরও অধিক সদস্য এ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব বোদো রামেলোও (Mr. Bodo Ramelow) এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং সবার উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। ইহুদী এবং খ্রিস্টানদের ধর্মীয় প্রধানরাও এই সম্মেলনে বক্তব্য প্রদান করেন। আহমদীয়া জামাতের মিশনারী, ইমাম মুহাম্মদ আরিফ সাঈদ সাহেবও সম্মানিত সদস্যদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি মুসলমানদের প্রতিনিধি হিসেবে ধর্মীয় শান্তির গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আলোকপাত করেন। পরবর্তীতে প্রাদেশিক মূখ্যমন্ত্রী এমটিএ কে বলেন, "ইমাম সাহেবের বক্তব্য আমাকে মুগ্ধ করেছে। থুরিগেন অঙ্গরাজ্যে মুসলমানদের সংখ্যা খুব একটা বেশি নয়। অতএব, মুসলমান সমাজের প্রতিনিধি হিসেবে আজ এই সম্মেলনে ইমাম সাহেবের যোগদান একান্ত আবশ্যক ছিল"।

জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে প্রদর্শনীর আয়োজন

জার্মানির ফ্রাঙ্কফোর্ট শহরে, ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে শহরটির প্রধান রেল স্টেশনে একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করে আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জার্মানি। ইসলামী সাহিত্য, প্লেকার্ড ও পোস্টারের মাধ্যমে ইসলামের সত্যিকার চিত্র জনসাধারণের সামনে তুলে ধরাই ছিল এ প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য। স্টেশনে যাতায়াতকারীদের মধ্যে প্রায় ৩০,০০০ নারী-পুরুষ এ প্রদর্শনী পরিদর্শন করেন।

এ সময় অনেকেই এমটিএ'তে তাদেও অভিব্যক্তি প্রকাশ করেছেন। এই প্রদর্শনী খুবই সফল হয়েছে কারণ, অনেকের মনেই ইসলাম সম্পর্কে যে নানা প্রশ্ন রয়েছে কিন্তু তারা কখনো এর উত্তর পায়নি অথবা এমনকি উত্তর খোঁজার চেষ্টাও করেননি।

বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও কতিপয় রাজনীতিবিদ সাধারণ মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির অপচেষ্টা করেছে। তাই সচরাচর এ ধরনের আয়োজন হওয়া উচিত যাতে মানুষ জানতে পারে, খ্রিষ্টধর্ম ও অন্যান্য ধর্মের মত ইসলামও শান্তির শিক্ষা দেয়।

প্রদর্শনীটি সম্পর্কে অনেক ইতিবাচক সাড়া মিলেছে। আর মুসলমানেরা তাদেও ধর্মীয় শিক্ষা উপস্থাপনের এরূপ আয়োজন খুব কমই করে থাকে।

জার্মানি জামাতের শ্রদ্ধেয় আমীর সাহেবও এর ইতিবাচক প্রভাব সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং বহু মুসলমান এর মাধ্যমে অনুপ্রাণিত হয়েছেন আর মুসলমান হিসেবে ইসলামের গুরুত্ব অনুধাবন করেছেন। যখন তারা জেনেছেন, এটি আহমদীয়া মুসলিম জামাতের আয়োজন তখন তারা নিজেদের অবস্থানের দিকে আবারও ফিরে তাকাতে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। এ প্রদর্শনী যে কেবল ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা দেবে তা-ই নয়; বরং মানুষের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত করতেও সহায়ক হবে।

বর্তমান বিশ্ব প্রেক্ষাপটে হুযূর (আই.)-এর বিশেষ দোয়ার তাহরীক

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) গত ২ অক্টোবর, ২০১৫ ইং, রোজ শুক্রবার লন্ডনের বাইতুল ফুতুহ মসজিদে জুমুআর খুতবায় নিম্নোক্ত তিনটি দোয়া বেশি বেশি পড়ার প্রতি জামা'তের সকল সদস্যকে নসীহত প্রদান করেন।

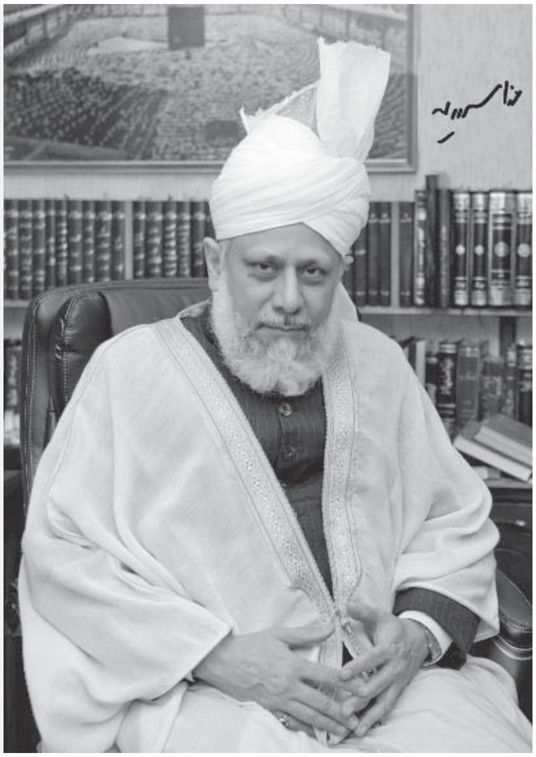

رَبِّ كُلُّ شَيْءٍ خَادِمُكَ
رَبِّ فَاحْفَظْنِي وَانْصُرْنِي وَارْحَمْنِي

"রাব্বি কুল্লু শায়ইন খাদিমুকা রাব্বি ফা'হফায্নী ওয়ানসুরনী ওয়ারহামনী।"

অর্থ : হে আল্লাহ্! সবকিছুই তোমার সেবায় নিয়োজিত। অতএব, হে আমার প্রভু! তুমি আমার নিরাপত্তা বিধান কর আর আমাকে সাহায্য কর এবং আমার প্রতি দয়া কর।

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِيْ نُحُوْرِهِمْ
وَنَعُوْذُبِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ

"আল্লাহুম্মা ইন্না নাজ্আলুকা ফী নুহূরিহিম ওয়া না'উযুবিকা মিন শুরূরিহিম।"

অর্থ : হে আমার আল্লাহ্! আমরা তোমাকে তাদের বক্ষদেশে স্থাপন করছি এবং তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

رَبَّنَآ اٰتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّ فِی الْاٰخِرَةِ
حَسَنَةً وَّ قِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴿۲۰۲﴾

"রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুনিয়া হাসানাতাওঁ ওয়া ফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার।"

অর্থ : হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! আমাদেরকে এ দুনিয়াতে এবং পরকালে যাবতীয় মঙ্গল দান কর এবং আগুনের আযাব থেকে আমাদেরকে রক্ষা কর।

*** এছাড়া হুযূর (আই.) ইস্তেগফার করার প্রতিও গুরুত্বারোপ করেন।**

اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّيْ مِنْ كُلِّ
ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَيْهِ

"আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বী মিন কুল্লি যামবিওঁ ওয়া আতূবু ইলাইহি।"

অর্থ : আমি আমার প্রভুর নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। আর তাঁরই কাছে প্রত্যাবর্তন করছি।

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

"আমি তোমার প্রচারকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাব।"

ইলহাম-হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

পৃথিবীর যে কোন প্রান্ত থেকে ইন্টারনেট-এর মাধ্যমে বাংলায়
যুগ-খলীফা (আই.) প্রদত্ত জুমুআর খুতবা ও সময়োপযোগী নির্দেশনাসহ
অমূল্য পুস্তকাদি, প্রবন্ধ, পাক্ষিক আহ্‌মদী ও অন্যান্য প্রকাশনা
পড়তে, শুনতে ও দেখতে **log in** করুন:

www.ahmadiyyabangla.org

www.alislam.org
www.mta.tv

আসুন, আমরা নিজে দেখি-পড়ি-শুনি এবং অন্যদেরকে উৎসাহিত করি।

সৌজন্যে:

KENTO ASIA LTD
Garments & Buying House

KENTO STUDIOS
IT & Game Developer

Head Office: House No: 16, Road No: 13, Sector 3, Uttata, Dhaka-1230, Bangladesh.
Tel:+880-2-8912349, 8919547, Fax:+880-2-8913396
Factory: Plot No: B-32, BSCIC Industrial Estate, Tongi, Gazipur, Bangladesh.
Tel: +880-2-9815695, 9815696
E-mail: managing-director@kento.org, info@kento.org
Web: www.kento.org

Right Management Consultants

Software Developer & MIS Solution Provider

Md. Musleh Uddin
CEO & MIS Consultants
BPL Bhaban, Suite # 303, 2nd floor, 89-89/1 Arambag, Motijheel, Dhaka-1000
E-mail: right_mc@yahoo.com, rightmc@gmail.com, web: www.rightmc.org
Cell: 01720 340 030, Land Phone: 7191965

হাড়-জোড়া, বাত-ব্যথা, স্পাইন এবং
আঘাত জনিত রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

ডাঃ মোঃ গোলাম রহমান (দুলাল)
এমবিবিএস, ডি-অর্থো (পঙ্গু হাসপাতাল)
এমএস (অর্থো)
সহকারী অধ্যাপক, অর্থোপেডিক বিভাগ
সাহাবউদ্দিন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল
মোবাইল: ০১৭১২-০৯০৮২৬

চেম্বার :
ইবনে সিনা ডায়াগনোস্টিক এন্ড কনসালটেশন সেন্টার, বাড্ডা
বাড়ি নং- চ-৭২/১, প্রগতি স্বরণী, উত্তর বাড্ডা
ঢাকা-১২১২, বাংলাদেশ।

সিরিয়ালের জন্য:
ফোন : +৮৮০ ২ ৮৮৩৫৫৫৬-৭
মোবাইল : ০১৮৩২-৮২০৯৫০

সময় : বিকেল ৫.০০টা থেকে ৮.৩০টা (শুক্রবার বন্ধ)
(বাড্ডা হোসেইন মার্কেটের বিপরীতে)

AMECON
NIAZ METALLIC

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536
H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari,
Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office
Palbari More, New Khairtola
Jessore. Tel : 67284

Bogra Office
Kanas Gari, Sherpur Road
Bogra. Tel : 73315

Chittagong Office
205, Baizid Bostami Road
Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

New Vol. No. 78 | 16th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

29th February, 2016 Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

জলই জীবন/ WATER THERAPY

জল চিকিৎসায় নিম্নবর্ণিত রোগসমূহ নিরাময় হয় :

(১) কোষ্ঠ কাঠিন্য (Constipation)- ১০ দিন পর এই চিকিৎসায় সর্বপ্রথম ফল পাবেন, (২) পাকাশয়জনিত রোগসমূহ (Gastric Problems)- ১০ দিন, (৩) উচ্চ রক্তচাপ (Hipertension)-১ মাস, (৪) বহুমূত্র (Diabetes)-১ মাস, (৫) ক্ষয়রোগ (Tuberculosis)-৩ মাস, (৬) চক্ষুকর্ণ নাসিকা রোগ (ENT Diseases)-৩ মাস, (৭) মুত্রথলী গ্রন্থি বৃদ্ধি রোগ (Enlargement of Prostate Gland)-৩ মাস, (৮) কর্কট রোগ (Cancer)-প্রথম থেকে রোগ ধরা পরলে ৬ মাস, (৯) পুরনো কঠিন চর্মরোগ-১ বছর।

জল চিকিৎসার নিয়ম :

(১) ঘুম থেকে উঠে মুখ না ধুয়ে কুলকুচি না করে (without mouth washing) শান্তভাবে ধীরে ধীরে ১.২৬০ লিটার অর্থাৎ বড় গ্লাসের ৪ গ্লাস জল পান করতে হবে। তাড়াহুড়া করা যাবে না। জলপান করার পর ৪৫ মিনিট কোন তরল বা শক্ত খাদ্য (Liquid or solid food) খাওয়া যাবে না। ধূমপান করা যাবে না।

(২) প্রাতঃরাশ, দুপুর ও রাতের আহার (Breakfast, Lunch and Dinner) করার সময় জল পান করা যাবে না। অসুবিধা হলে গলা ভেজাবার জন্য ২/৩ চামচ পরিমাণ জল খেতে পারেন। এই পরিমাণ বাড়ানো যাবে না। দুই ঘন্টা পর ইচ্ছেমত জল পান করা যাবে, দুর্বল বা অসুস্থ হলে চার গ্লাসের পরিবর্তে ১ অথবা ২ গ্লাস দিয়ে শুরু করতে পারেন। তবে অবশ্যই চার গ্লাস পান করতে হবে। যে কোন রোগই জল চিকিৎসায় নিরাময় হতে পারে। বাতজনিত রোগে প্রথম ৭ দিন সকালে ও বিকালে ২ বার এই চিকিৎসা করতে হবে। উপশমের পর শুধু সকালে করলে চলবে।

(৩) দুপুর ও রাত্রে আহার করে শোয়ার পূর্বে অন্ততঃ আধাঘন্টা অপেক্ষা করতে হবে। ঘুমানোর পূর্বে কোন কিছু আহার করা যাবে না। অসুবিধা মনে হলে ঘুমানোর আগে ২/৩ চামচ জল পান করা যাবে।

ধানসিড়ি রেস্তোরা

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
নীচ তলা
রোড নং ৪৫, প্লট ৩২/এ, গুলশান- ২, ঢাকা- ১২১২
ফোন: ৯৮৮২১২৫, ৮৮৫০৩২৩,
০১৯১৩৯৪১৩৯২, ০১৯১৯২৭১২৮৬

ধানসিড়ি রেস্তোরা-১
অর্কিড প্লাজা (তৃতীয় তলা)
(রাপা প্লাজার দক্ষিণ পার্শ্বে)
ধানমন্ডি, ঢাকা।
ফোন : ৯১৩৬৭২২, ০১৮১৯০৯৯০৩৫

**"দিল মেঁ য়্যাহী হ্যা হারদাম তেরা সাহীফা চুমুঁ
কুরআঁ কে গিরদ্ ঘুমুঁ কা'বা মেরা য়্যাহী হ্যা"**

আমার আন্তরিক বাসনা হলো, সর্বদা যেন তোমার কিতাব চুম্বন করি আর কুরআনের চতুর্দিকে প্রদক্ষিণ করি; বস্তুত আমার কা'বা এটাই।

–হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)

শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ-এর প্রতিষ্ঠা শতবার্ষিকী উপলক্ষে বহু প্রতিক্ষিত শতবার্ষিকী স্মরণিকা প্রকাশ হয়েছে।

এটি ইতিহাস ও তথ্যের এক অতুলনীয় সন্নিবেশ। এতে হুযূর আকদাস (আই.)-এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে ঐতিহাসিক ভাষণ এবং স্মরণিকার জন্য হুযূর আকদাসের বিশেষ বাণী রয়েছে।

এতে আরো রয়েছে, এই বাংলা এবং পশ্চিমবঙ্গের পাশাপাশি থেকে পথচলার দুর্লভ ইতিহাস। রয়েছে বাংলাদেশের সকল মসজিদ ও মিশনের সচিত্র একটি সংগ্রহ। এছাড়াও এতে এমন কিছু তথ্য রয়েছে যা ইতিপূর্বে কখনও সামনে আসে নি। এতে রয়েছে, প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে শতবর্ষের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। এছাড়াও রয়েছে ঈমান উদ্দীপক ও ইতিহাস সম্বলিত অনেক প্রবন্ধ। দু'শত বত্রিশ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় আরো এমন বিষয় রয়েছে যা সত্যিই সংগ্রহ করে রাখার মত। তাই যত শিঘ্র সম্ভব আপনার কপিটি বাংলাদেশের ইশায়াত বিভাগে যোগাযোগ করে সংগ্রহ করুন।

স্মরণিকাটির শুভেচ্ছা মূল্য ৩০০/- (তিন শত) টাকা। প্রয়োজনে : ০১৭৩৬ ১২৪৭০৪

Printed and Published by **Mahbub Hossain** at Ahmadiyya Art Press, 4 Bakshi Bazar Road
Dhaka-1211 on behalf of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Mohammad Habibullah**
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
Phone: 7300808, 7300849 Fax: 880-2-7300925, e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com